নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খন্ড ৫

নভেম্বর ১৯৯৭

সম্পাদক

হাসান শরীফ আহমেদ

সম্পাদনা পরিষদ

সালেহউদ্দীন আহমেদ, আমিনুল আলম, সাদিয়া এ চৌধূরী

কানিজ ফাতেমা ও মুঃ গোলাম সাত্তার

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

গ্রন্থস্বত্ব : ব্র্যাক

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ১৯৯৭

প্রকাশক : ব্র্যাক, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭৫ মহাখালী
ঢাকা-১২১২

মুদ্রণ : ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১২১২

১৯৯৫-এর গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত ২২টি রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নহেন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষকগণের একান্ত নিজস্ব।

সুচিপত্র

সম্পাদকীয় ১

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

- ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ঃ একটি বিশেষ সমীক্ষা ৩
- ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা ঃ একটি সমীক্ষা ৯
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব ঃ ঝিকরগাছা এলাকার চিত্র ১২
- গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের ঋণদান কর্মসূচির প্রভাব ঃ জামালপুর জেলার পাঁচটি গ্রামের চিত্র ১৫
- মহিলা প্রধান খানার সমস্যাসমূহ ১৮
- গ্রাম সংগঠন সদস্যদের সঞ্চয়ী অর্থের ব্যবহার ২২
- নারী পুরুষ সম্পর্কের উপর মহিলাদের মজুরীভিত্তিক কাজ ও ঋণের প্রভাব ২৪
- ঋতুভেদে গ্রামীণ দরিদ্রদের খাদ্য গ্রহণের তারতম্য ঃ একটি সমীক্ষা ২৮
- লক্ষীভূত জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ আরআরএ পদ্ধতি প্রয়োগ ঃ লালমনিরহাট সদর থানার একটি সমীক্ষা ৩১
- গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশু শ্রম ৩৩
- সাক্ষরতার প্রসার ঃ মানিকগঞ্জের ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব ৩৫
- উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের আদর্শায়িত কৃতি অভীক্ষা। ৩৮

♦ ছেলে ও মেয়েদের স্কুলে ভর্তির অবস্থা ঃ প্রেক্ষিত গ্রাম বাংলা ৪০

♦ ভর্তির প্রথম ছয় মাসের মধ্যে স্কুল ছেড়ে দেয়ার কারণ ঃ ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর একটি সমীক্ষা ৪৩

স্বাস্থ্য বিষয়ক

♦ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মী ঃ ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা ৪৬

♦ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ধরন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের সমাজ ৫০

♦ পাঁচ বছরের কম বয়সী গ্রামীণ শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির উপর একটি সমীক্ষা ৫৪

♦ মায়েদের টিকাদান সম্পর্কিত জ্ঞান গ্রামীণ এলাকায় শিশুদের টিকাদানের ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখে? ৫৬

♦ পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইজিভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব ৫৮

♦ পরিবারের আকার নির্ধারণে মতলব এলাকায় দম্পতিদের পছন্দ ৬২

♦ জন্মশীলতা পরিবর্তনে গ্রামীণ এলাকায় ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব ৬৫

♦ কর্মসূচিভূক্ত এলাকায় গর্ভনিরোধক ব্যবহারে পরিবর্তন ৬৮

সম্পাদকীয়

উন্নয়ন কার্যক্রমের বিকাশ, প্রসার ও গতিশীলতার জন্য গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। কোন কার্যক্রম পরিচালানা করতে গেলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আর এ সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনে বের করতে হয় এর উৎসমূল। এ জন্যই প্রয়োজন হয় গবেষণার। ব্র্যাকের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গবেষণার প্রয়োজন অতীব। ১৯৭৫ সালে চালু হয় একটি পরিসংখ্যান ইউনিট যা আজকের পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ। এ বিভাগ আজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশত গবেষণা সম্পন্ন করেছে। গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ গবেষণার এ ফলাফল সর্ব সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী। সিংহভাগ ইংরেজী ভাষায় লিখিত এগবেষণা প্রতিবেদনগুলোর সংক্ষিপ্তাকারে ও সাবলীল ভাষায় অনুদিত একটি রূপ হল নির্যাস। গবেষণার ফলাফলগুলো ব্র্যাকের মাঠকর্মীদের কাছে পৌঁছোনোর লক্ষ্যেই প্রধানত: নির্যাস প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমাদের বিশ্বাস নির্যাস পাঠে সকলেই উপকৃত হবে, জানতে পারবে ব্র্যাকের কর্মকান্ড সম্পর্কে। ব্র্যাকের সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের অর্জিত সাফল্য ও বিশাল কর্মকান্ড সম্পর্কে কিছুটা হলেও ‘নির্যাস’ থেকে জানা সহজ হবে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্র্যাকের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হল। পঁচিশ বছর পূর্বের ব্র্যাক আর আজকের ব্র্যাক- এক বিশাল ব্যবধান। আজকের ব্র্যাক এক বহুমুখী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান শিশু কিশোর ও বয়স্কদের জীবনোপযোগী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, ঋণদান এবং আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অসহায় মানুষদের ক্ষমতায়ন ও জনশক্তি উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্র্যাকের কর্মকান্ড বিস্তৃত। অথচ ২৫ বছর পূর্বে সিলেটের শাল্লায় পুনর্বাসন ও ত্রাণ বিতরণ ছিল গ্রাম উন্নয়ন অভিজ্ঞাতার সুত্রপাত। আজকের ব্র্যাক তার পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিকে ছড়িয়ে দিয়েছে ৩৬,৯৫১টি গ্রামে ১৮,০০,০০০ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে, ব্র্যাকের ৩৪,৫০০টি এনএফপিই স্কুলের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের ১১,০৮,৬৮৫ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে যার অধিকাংশই মেয়ে, মহিলা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ব্র্যাক ১২,০৫১ টি গ্রামের এক কোটি ১৫ লক্ষ লোকের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ১,১৫২টি সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ব্র্যাকের নিবেদিত কর্মীরা মাত্র এক দশকে (১৯৮০-১৯৯০) বাংলাদেশের অশিক্ষিত দরিদ্র

জনগণের ঘরে ঘরে গিয়ে ১ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবারকে স্যালাইন তৈরীর প্রশিক্ষণ দিয়েছে। পঁচিশ বছরের খতিয়ান অবশ্য এই স্বল্প পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়। এ কর্মকান্ডের কিছুটা নির্যাসের মাধ্যমে হয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে।

১৯৯৫ সালে পরিচালিত সকল গবেষণা প্রতিবেদন থেকে বাছাইকৃত ২২টি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। নির্যাসের গঠনমূলক সমালোচনাকে আমরা তাৎপর্যবহ বলে মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের সমালোচনা নির্যাসের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

নির্যাস সম্পর্কে আপনাদের যে কোন মতামত আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

সম্পাদক

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ঃ একটি বিশেষ সমীক্ষা*

শামস্ মোস্তফা, ইশরাত আরা, দিলরুবা বানু, সারোযার জাহান, আজমল কবীর, আবু ইউসুফ, আলতাফ হোসাইন ও মোঃ মোহসীন

ব্র্যাকের সকল কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষমতায়ন। এ লক্ষ্য সাধনে ১৯৮৬ সাল থেকে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বা রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরডিপি) বিভিন্ন কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সাল থেকেই মানিকগঞ্জ এবং তারও পূর্বে সিলেটের শাল্লা এলাকায় সমন্বিত প্রকল্পের আওতাধীন পল্লী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। পল্লীর দরিদ্র জনসাধারণকে সংগঠিত করে তাদের সচেতন করে তোলা, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজে জড়িত করে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা, দুঃস্থ মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি এ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিক।

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে তা মূল্যায়নের জন্য ইংল্যান্ডের সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্রের সহযোগিতায় ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি সমীক্ষা চালায়। এ সমীক্ষার জন্য ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মহিলাদের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন ও উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার (এনএফপিই) উপর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আরডিপিভূক্ত খানা এবং এ কর্মসূচি বহির্ভূত খানার তুলনামূলক আর্থ- সামাজিক অবস্থা নিরূপণের জন্য নির্বাচিত ১৫টি এরিয়া অফিস থেকে ১০টি করে মোট ১,৫০০টি সদস্য খানা বাছাই করে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়।

আবার আরডিপি বহির্ভূত এলাকার ৭৫টি গ্রাম থেকে একই আর্থ-সামাজিক অবস্থার ১০টি করে মোট ৭৫০টি খানা বাছাই করা হয। তবে বাছাইকৃত ১৫০০ সদস্যের মধ্যে থেকে কিছু সদস্য সংগঠন ছেড়ে চলে যায় ফলে ১৩৬৬ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। গুণগত ও মানসম্মত তথ্য সংগ্রহের জন্য কেস্ স্টডি

* Summary of the RED research report entitled 'RDP Impact Assessment Study' by Shams Mustafa, et al. 1995. 59p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। ১৫টি এরিয়া অফিস থেকে ২৪টি গ্রাম সংগঠনকে এই কেস্‌ স্টাডির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরডিপি'র ভূমিকা

দারিদ্র্য বিমোচনে আরডিপি'র ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য এ সমীক্ষায় চারটি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; টিকে থাকার ক্ষমতা ও অক্ষমতা হ্রাস; মহিলাদের জীবন যাত্রার মানে পরিবর্তন ও প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রাম সংগঠন। এ সমীক্ষায় পুরাতন ও নতুন সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নের পার্থক্য দেখা হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সদস্যদের উপর আরডিপি'র ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। নতুন সদস্যদের চেয়ে পুরাতন সদস্যদের খানা সম্পদ অনেক বেশি (১১২%), আর্থিক মূল্যে গড় মূলধনও অনেক বেশি (১০০%), খানার সাপ্তাহিক ব্যয় ২৬% বেশি এবং মাথাপিছু ব্যয়ও ১৫% বেশি। দেখা গেছে, বেশি দরিদ্র খানায় এ কর্মসূচির প্রভাব বেশি পড়েছে। পুরাতন সদস্যদের বেলায় দেখা গেছে, তাদের মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে যা তাদেরকে আর্থিক নিশ্চয়তা ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। যারা পুরাতন সদস্য এবং আরডিপি থেকে ৭,৫০০ টাকা বা তার বেশি ঋণ পেয়েছে তাদের আর্থিক নিশ্চয়তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ঋণ ব্যবহার করে পুরুষদের তুলনায় মহিলারাই অতি দ্রুত তাদের ভাগ্য বদলে নিতে পেরেছে।

সদস্যদের টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংকট মোকাবেলায় আরডিপি'র ভূমিকা

দেখা গেছে, পুরাতন সদস্য খানাসমূহের গড় সম্পত্তি নতুন সদস্য খানার তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা বেশি পূর্বে সদস্য হয়েছে তাদের আয় ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা বছর এদেশের দরিদ্র মানুষ সম পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারে না। তাই সব মৌসুমে তাদের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান থাকে না। মন্দা মৌসুমে তারা জীবন ধারণের জন্য তাদের সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে। দেখা গেছে, আরডিপি সদস্যরা এ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পরিত্রাণ পাচ্ছে। ভরা ও

মন্দা মৌসুমে পুরাতন সদস্যদের খাদ্য বাবদ ব্যয়, খাদ্য মজুদ, অর্থ আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য কমেছে অর্থাৎ মন্দা মৌসুমে তাদেরকে পূর্বের মত কষ্টের শিকার হতে হয় না।

দেখা গেছে, কোন কোন খানা মহাজনদের কাছ থেকে অধিক পরিমাণ ঋণ নিয়ে শোষনের শিকার হয়ে সর্বস্ব হারিয়েছে। তবে আরডিপিভূক্ত হওয়ার পরে তাদের এই অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নেয়ার হার হ্রাস পেয়েছে। সদস্যরা এখন অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে কিছু ঋণ নিলেও তা ভোগের জন্য ব্যবহার না করে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করছে। খানার সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি, আর্থিক প্রবৃদ্ধি, মূলধন বৃদ্ধি ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়, আরডিপি সদস্যদের আর্থিক নিশ্চয়তা ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধিসহ তাদের সার্বিক উন্নয়নে আরডিপি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন সাধনে আরডিপি'র প্রভাব

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি মহিলাদের ক্ষমতায়নে, তাদের আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিতকরণে এবং পরিবারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ব্র্যাকের আরডিপি গ্রাম সংগঠনের শতকরা ৮২ ভাগ সদস্য হচ্ছে মহিলা এবং তারা মোট ব্র্যাক ঋণের প্রায় তিন চতুর্থাংশ (৭৪%) পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মহিলাদের নেয়া ঋণ পরিবারের আয়মূলক কাজে পুরুষরাই ব্যবহার করে এবং সাপ্তাহিক কিস্তির টাকা ঠিকমত শোধ করে দেয়। মহিলাদের নেয়া ঋণের টাকা কেন তাদের স্বামীর হাতে তুলে দেয়, এ সম্পর্কে অনেক মহিলার মন্তব্য হচ্ছে যে, ব্র্যাক ঋণ দেয় পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য এবং ভরন পোষণসহ পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব স্বামীরাই পালন করেন তাই তাদের নেয়া ঋণ স্বামীই কাজে লাগাবেন। সেই সাথে মহিলারা এটাও জানিয়েছেন যে, ব্র্যাকের ঋণ নেয়ার ফলে পরিবারে তাদের কর্তৃত্ব বেড়েছে। তাদের মর্যাদা বেড়েছে, স্বামীদের নির্যাতন কমেছে ও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের হার কমেছে।

পলী উন্নয়ন কর্মসূচি মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে অবদান রাখলেও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে খুব একটা ভূমিকা রাখতে পারেনি। ফলে সামাজিক নিয়ম-নীতি ও ধর্মীয় বাধা নিষেধ এখনও মহিলাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সঙ্গে অল্পদিন আগে যুক্ত হয়েছে এমন সব মহিলাদের অধিকাংশ জানান, তাদের নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় করার ব্যাপারে তারা পূর্ণ অধিকার ভোগ করছেন। শতকরা ১৬ জন মহিলা জানান, পারিবারিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এখনও স্বামীদের হাতেই রয়ে গেছে। তার চেয়ে কিছু বেশি সংখ্যক (২১%) মহিলা জানান, স্বামী ও স্ত্রী মিলেই সব সিদ্ধান্ত নেয়। অপর দিকে চার বছর বা তারও বেশি পুরাতন গ্রাম সংগঠনের মহিলাদের প্রায় অর্ধেকই (৪৭%) জানান, কিভাবে তাদের আয়ের টাকা খরচ হবে , তা তারা নিজেরাই ঠিক করেন। এইসব সংগঠনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ (৩০%) মহিলা সদস্য বলেন, খরচের ব্যাপারটি তারা স্বামী-স্ত্রী মিলেই ঠিক করে। অনুরূপ প্রবণতা আরডিপি থেকে মহিলাদের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়।

দেখা গেছে, রাজনৈতিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা এখনো মহিলারা তেমন একটা অর্জন করতে পারেনি। ভোট দানের প্রশ্নে তারা সমাজে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ১৪টি গ্রাম সংগঠনের মহিলা সদস্যরা বলেন, তারা কাকে ভোট দিবে তা তাদের স্বামীরাই ঠিক করবেন। অধিকাংশ মহিলাদেরই ধারণা, ভোটের ব্যাপারে স্বামীরা যা বলবেন সেভাবেই ভোট দেয়া উচিত।

উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা

সমীক্ষায় নেয়া ১৬টি গ্রাম সংগঠনের মধ্যে ১২টিতে কমপক্ষে একটি করে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক (এনএফপিই) স্কুল রয়েছে। ১২টি এলাকার শতকরা ২০ ভাগ খানা তাদের ছেলে মেয়েদের ব্র্যাকের স্কুলে পাঠায়। আর ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ খানার ছেলে মেয়েরা ব্র্যাকের স্কুলে যায়। ১২টির মধ্যে ৫টি সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ ছিল, ধনী পরিবারের ছেলে

মেয়েরাই ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় বেশি। ছেলে মেয়েদের ভর্তির ব্যাপারে কর্মসূচি সংগঠক ও শিক্ষকগণ তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে গ্রামের সচ্ছল লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

কতিপয় সদস্যদের মতে, ধনী খানাগুলোর ছেলে মেয়েদেরকে ব্র্যাকের স্কুলে পাঠাতে চায়, কারণ এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে উন্নত। ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল সম্পর্কে সকল মাতা পিতারই ইতিবাচক ধারণা রয়েছে। কারণ ক্লাসের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট, শিক্ষকগণ সময়ানুবর্তী, পরিশ্রমী এবং স্কুলগুলোও বাড়ির খুব কাছাকাছি। বলা যায়, স্কুলগুলো দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

আরডিপি'র গ্রাম সংগঠন

সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে গ্রাম সংগঠনগুলো কাঙ্খিত অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সংগঠনের নিয়মকানুন মেনে চলার ব্যাপারে পুরানোদের চাইতে নতুন সদস্যগণ বেশি যত্নশীল। সদস্যদের মধ্যে একাত্মতাবোধ যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে ওঠেনি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তারা স্বাবলম্বী হতে পারেনি। নেতৃত্ব নির্বাচন ও পরিবর্তনে উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অবশ্য পুরুষদের তুলনায় মহিলা সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব এসেছে অধিকতর অসচ্ছল খানা থেকে।

উপসংহার

গ্রামীণ অর্থনীতি পুনর্জীবিতকরণে আরডিপি'র ভূমিকা অপরিসীম। যে সকল মহিলারা আর্থিক, সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নিপীড়িত ছিল আরডিপিতে যোগদানের পর তাদের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। দেখা দেছে, যে সকল মহিলা দীর্ঘদিন যাবৎ সদস্য আছেন এবং ঋণ বেশি নিয়েছেন তাদের অর্থ উপার্জন, ব্যয়, খাদ্য মজুদ, নিরাপত্তা ইত্যাদি বেশি সন্তোষজনক। বলা যায়, মহিলাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য একই সাথে দুটো জিনিষ গুরুত্ববহঃ দীর্ঘদিন সংগঠনের সদস্য হিসেবে ব্রত থাকা এবং

ঋণের পরিমাণগত দিক। দেখা যায়, ঋণ ব্যবহার করে পুরুষদের তুলনায় মহিলারাই বেশি উন্নতি লাভ করেছে। সমপরিমাণ ঋণ দেয়া সত্ত্বেও মহিলারাই বেশি লাভবান হয়েছে।

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা ঃ একটি সমীক্ষা*

টি টি ইভান্স, মোঃ রফি, এলেনা এ্যাডাম্‌স ও মোশতাক চৌধুরী

ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি) অন্যতম। এ কর্মসূচি একটি এরিয়া অফিসের মাধ্যমে শুরু হয়। একজন কর্মসূচি সহকারী গ্রামে গিয়ে লক্ষীভূত খানাগুলোকে প্রথমে চিহ্নিত করে। তার পরে তিনি পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বা আরডিপি সম্পর্কে গ্রামীণ জনগণকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রাম সংগঠনে যোগ দিতে বলেন। যখন ২০-২৫টি খানা সংগ্রহ হয়ে যায় তখন একটি গ্রাম সংগঠন গঠন করা যায়। তবে সর্বোচ্চ ৫০ জনকেও নেয়া যায়। সাধারণত ৩৫-৪০ জনকে নিয়েই এক একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রত্যেককে নিবন্ধন ফি বাবদ ১০ টাকা এবং প্রতি সপ্তাহে দুই টাকা সঞ্চয় জমা দিতে হয়। গ্রামে দারিদ্র্য মোচন করা এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত এলাকার খানাগুলোর দারিদ্র্য পরিস্থিতি এবং কত সংখ্যক দরিদ্র লোক আরডিপিতে যোগ দিচ্ছে তা মূল্যায়ন করা এ গবেষণার উদ্দেশ্য। তাছাড়াও যে সকল ব্যক্তি বা খানা যারা ব্র্যাক কর্মসূচিতে গ্রহণযোগ্য অথচ বিভিন্ন কারণে যোগ দিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের সামাজিক অবস্থান নিরূপণ, সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা, তাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য অবস্থা বর্ণনা করা এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই সমীক্ষার জন্য প্রথমত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির পাঁচটি সুপ্রতিষ্ঠিত এলাকা অফিসের আওতাধীন ৭৮টি গ্রাম সংগঠন নির্বাচিত করা হয়। মোট ৩৫টি গ্রামে যেগুলোতে এই সব সংগঠনের অধিকাংশ সদস্য অবস্থান করে সেগুলোকে জরিপ করা হয়।

এই সকল গ্রামে অবস্থানরত ২৮,২৩৪টি খানাকে তিনটি সম্পদ দলে ভাগ করা হয়। প্রথম সম্পদ দল- মোটামুটি জমি আছে, কিছু সম্পদ আছে এবং ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারে। দ্বিতীয় সম্পদ দল-

---

* Summary of the RED research report entitled 'Barriers to participation in BRAC RDP' by T G Evans et al. 1995 November. 35p. (Summarized in Bangla by Shah Asad Ahmed)

জমি ও সম্পদ খুব কম এবং কোন মতে বেঁচে আছে। তৃতীয় সম্পদ দল- জমি ও সম্পদ নেই বললেই চলে এরা অসুস্থতা এবং দারিদ্র্যের কারণে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে সংকিত। এটা উল্লেখ্য করা যেতে পারে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্পদ দল পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার যোগ্য।

এছাড়াও প্রত্যেক গ্রাম থেকে ৩০টি খানা প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই ৩০টি খানার মধ্যে ১০টি হল পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সদস্যদের খানা, ১০টি হল সদস্য হওয়ার যোগ্য কিন্তু অসদস্য খানা, ৫টি প্রাক্তন সদস্যের খানা এবং ৫টি সদস্য হওয়ার মাপকাঠিতে যোগ্য নয় এম অ-সদস্য খানা। খানার গঠন, স্বাস্থ্য, অতীত সংকটসমূহ, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদির উপর কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে মোট ১৬৩৭টি খানা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, গ্রামের ৭৫ ভাগ খানা সমূহ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সম্পদ দলে অন্তর্ভুক্ত। পরিমাণে এসব বিশাল দলের খানাসমূহ সদস্য হওয়ার যোগ্য অথচ তার মাত্র তিন ভাগের একভাগ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সদস্য। যদি ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অন্যান্য বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠনের প্রাক্তন সদস্যদের হিসাবে আনা হয় তাহলে দেখা যায় যে, বর্তমানে ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ সদস্য হওয়ার যোগ্য অথচ সদস্য হন নাই বা হতে পারেন নাই অর্থাৎ কর্মসূচির বাইরে রয়ে গেছেন। এই সকল তথ্য সুস্পষ্টভাবে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে ইঙ্গিত করে যে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

যারা সদস্য নয় অথচ সদস্য হওয়ার যোগ্য এমন খানার মধ্যে প্রায়শঃই দেখা যায় যে, কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত বয়স্ক মহিলা নাই, খানার আকৃতি ছোট এবং ব্যক্তি প্রতি মাসিক আয় নিম্ন। এইসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটা চতুর্থ দল চিহ্নিত করা যায়, যার হার সদস্য হওয়ার যোগ্য কিন্তু সদস্য নয় এমন অসদস্যের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ, অল্প কথায় সদস্য হওয়ার যোগ্য খানার শতকরা ২৮ ভাগ। এই চতুর্থ দলের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের উপর নির্ভর করে না বরং তা নির্ভর করে এটা জানার উপর, কেননা এই খানাসমূহের ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে যোগদান করার সম্ভাবনা কম।

এসব কারণসমূহ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি hypothesis test করা হয়। খানার সম্পদ টাকা, সময় এবং চিন্তা করার ক্ষমতার অভাব সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সকল কারণ চতুর্থ দল যা বিত্ত-সম্পদ দল তিন এর অন্তর্ভুক্ত এবং নিম্ন আয়ের মহিলা প্রধান খানাসমূহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ভগ্ন স্বাস্থ্য, ঘন ঘন সংকট, জীবন চক্রের চরমতা এবং মহিলা প্রধান হওয়ার কারণেও অনেকে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারছেন না। তবে ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং সংকট সমানভাবে সদস্য এবং অসদস্য খানার মধ্যে দেখা যায়। যদিও মহিলা প্রধান খানাসমূহ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন, তাদের চরম অস্বচ্ছলতা সম্মলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা, খানার ক্ষুদ্র আকার, নিম্ন বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি। এবং অপ্রত্যাশিত হারে চতুর্থ দলে ভীষণ গরীব খানাসমূহের উপস্থিতি নির্দেশ করে যে, এক্ষেত্রে আরও গবেষণা প্রয়োজন যা তুলে ধরবে যে কেন কিছু মহিলা প্রধান খানা পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন এবং কেন কিছু খানা তা করছেন না।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব ঃ ঝিকরগাছা এলাকার চিত্র*

শান্তনা রানী হালদার

জনসংখ্যার চাপ ও আবাদি জমির স্বল্পতার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ভূমিহীন চাষী ও বেকারত্ব। তাই ফলস্বরূপ ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৯ এর মধ্যে বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ৮০ লক্ষ থেকে বেড়ে ১ কোটি ৩০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। ব্র্যাক তার পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আরডিপি) মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য স্থানীয় জনগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করেছে। এ উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে আর্থিক, কারিগরী ও অন্যান্য সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

এ সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে ব্র্যাক তার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মোট কতজনের কর্মসংস্থান করেছে এবং কত শ্রম দিবস তৈরি করেছে তা দেখা এবং কর্মসংস্থানে ব্র্যাকের সাফল্য কতটুকু, পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব কিরূপ, ইত্যাদি নিরূপন করা। এ সমীক্ষার জন্য যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানায় দুটি পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি এলাকার মধ্যে একটি বাছাই করা হয় যার আওতায় ৫টি ইউনিয়নে ১৪০টি গ্রাম সংগঠন আছে। এ সমীক্ষার জন্য মোট ৩৫০ জনকে বাছাই করা হয়। এর মধ্যে ব্র্যাকের বেতনভোগী কর্মচারীও রয়েছে।

সমীক্ষায় দেখা যায়, ঝিকরগাছাতে ব্র্যাকের ৫০ জন বেতনভোগী কর্মচারী ছাড়াও সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে এবং তুঁতগাছের কেয়ারটেকার পদে আরও ১১৪ জন লোক নিয়োজিত আছে যারা ব্র্যাকের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধা পাচ্ছে। ব্র্যাক এককভাবে ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহযোগিতায় দৈনিক মজুরীভিত্তিক কাজ সৃষ্টি করেছে ৮৩ জনের। শিক্ষক পদে খন্ডকালীন মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান করেছে ১০৯ জনের, যার বেশিরভাগই মহিলা।

---

* Summary of the RED research report entitled 'BRACs achivements in generating employment in Jhikargacha RDP area; a quantitative study' by Shantana R Halder. 1995 April. 38p. (Summarized in Bangla by AKB Rahman)

ব্র্যাকের সহায়তায় কাঁথা সেলাই কাজে ১৫০ জন মহিলার পূর্ণ সময়ের জন্য ব্র্যাক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। ব্র্যাক এদেরকে মালামাল সরবরাহ করে থাকে এবং আড়ং এর মাধ্যমে উৎপাদিত মালামাল বাজারজতকরণের সুবিধাদি দিয়ে থাকে।

রেশমচাষ, বৃক্ষরোপণ, হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালন, শাক-সবজি ও ভূট্টার চাস, চারা তৈরি, ফুলের চাষ, মাছ চাষ, গভীর নলকুপ স্থাপন, ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে পলী অঞ্চলে ব্র্যাক দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব অবসানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রেশমচাষে গুটিপোকা পালনকারী হিসাবে মোট ১২৯ জন দরিদ্রলোক কাজ করছে, যার বেশির ভাগই মহিলা।

ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ, উন্নতজাতের বাচ্চা সরবরাহ ও আর্থিক সহযোগিতায় হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালনে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ফলে ২,৪৯৩ জন মহিলা ও পুরুষ এই কর্মসূচির সাথে জড়িত হতে পেরেছে। ব্র্যাকের সহযোগিতায় শাকসবজি ও ভূট্টা চাষে বেশ উৎসাহ সৃষ্টি হয়। গত তিন বছরে ব্র্যাক ২৬৮ জন শাক সবজি উৎপাদনকারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তারা প্রায় সবাই এখন শাকসবজি উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। সেচ কর্মসূচি ১৯৯২ পর্যন্ত ৭টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে ৬৪৩ জন চাষীকে সম্পৃক্ত করে ২৩৯ একর জমিতে সেচ সুবিধা দিয়েছে। এছাড়া ৪০ জন নলকূপের অংশীদারদের আয় বেড়েছে ও সেচ মৌসুমে দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান অনেক হয়েছে।

মাছ চাষ প্রকল্প শুরু হয় ১৯৮৮ তে। মজা পুকুর পুনঃ খননের কাজে ১৯৯৪ এ ১৫,৮৯৮ শ্রমদিবস ব্যয় হয়। ১১৬ জন কৃষক, যার অধিকাংশই মহিলা, মাছ চাষের বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে অর্থ উপার্জন করছে।

কপোতাক্ষ নদীতে মাছ চাষের জন্য ১০১ জন চাষী ব্র্যাকের কাছ থেকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ১৪,৩৫২ একর কৃত্রিম বাওর সৃষ্টি করে মাছ চাষ প্রকল্প শুরু করেছে। ব্র্যাক ৩,২৭৭ জন ঋণ গ্রহীতাকে (বেশির ভাগ মহিলা) ধান ছাঁটাই (৪৫%) ছোট ব্যবসা (২৯%) হাঁস মুরগী ও গরু ছাগল পালন (২২.৫%), গ্রামীণ যানবাহন (০.২), জমি লীজ গ্রহণ, ইত্যাদি প্রায় ৩০০ রকম খাতে প্রত্যেককে

২,০০০-১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়েছে। তাই বলা যায় যে, সহযোগিতা দিয়ে বেকারত্ব ঘোচাবার প্রয়াসে নতুন নতুন কর্মসংস্থান করতে পারা ব্র্যাকের একটা বড় ধরনের সাফল্য। ব্র্যাক তার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে ৬,৮১৮ জনের কর্মসংস্থান করেছে এবং মোট ২,৩৯১ (প্রতি ৩.৫ জনের এক জন) শ্রম দিবস তৈরি করেছে।

ব্র্যাকের কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার জন্য কিছু সুপারিশ রাখা হয়েছে। যেমন, ব্র্যাক রেশম চাষে সার্ভিস চার্জ বাবদ ডিএফএস প্রতি ১ টাকা থেকে ৭০ পয়সায় কমালে এই খাতে আরও আয় ও কর্মসংস্থান বাড়তে পারে। আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন আরও অধিক উপকেন্দ্র ও উৎপাদন বাড়িয়ে আড়ং এর অধিকতর চাহিদা মেটাতে পারে। ব্র্যাক তার ঋণ অপব্যবহার ও অনাদায় রোধে ঋণ গ্রহীতাদের উৎপাদন বাড়াবার জন্য যথাযথ তদারকীর প্রচেষ্টা চালাতে পারে। উৎপাদিত মালামাল বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ব্র্যাকের সহযোগিতা আরো সুফল বয়ে আনতে পারে।

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের ঋণদান কর্মসূচির প্রভাব ঃ জামালপুর জেলার পাঁচটি গ্রামের চিত্র*

শামীম আরা বেগম

স্বাধীনতার পরে কতিপয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান শুরু করে এবং এর পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংক অন্যতম। কিন্তু দেখা গেছে, যুগযুগ ধরে চলে আসা মহাজনী প্রথায় গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণের ব্যবসা বেশ জমজমাট। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ ঋণ দেয়া হয় তার শতকরা মাত্র এক ভাগ মহিলাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতার জন্য নগন্য এ সুযোগটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। অথচ দেখা গেছে, ব্র্যাক কর্তৃক ১৯৯৩ সালে বিতরণকৃত মোট ঋণের ৮৩% সরাসরি মহিলারা পেয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার ব্র্যাক প্রদত্ত ঋণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে কি প্রভাব ফেলেছে তা দেখার জন্য জামালপুর জেলার পাঁচটি গ্রামে এ সমীক্ষা চালানো হয়। জামালপুর সদর থানার দুটো আরডিপি এলাকার পাঁচটি গ্রাম এ জন্য বাছাই করা হয়। এই পাঁচটি গ্রামে ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা থেকে পঞ্চাশ জন পুরুষ এবং পঞ্চাশ জন মহিলাকে বাছাই করা হয়। এরা সবাই ব্র্যাকের কর্মসূচিভূক্ত গ্রাম সংগঠনের সদস্য। এ সমীক্ষায় ১৯৭৭-১৯৯২ সালে ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দেখা গেছে, গবেষণাভূক্ত পাঁচটি গ্রামের মোট ৮৮৭টি খানার লোক সংখ্যা ৪,০৯৬ জন যার অর্ধেক লোক কৃষি কাজ ও দিন মজুরী এবং এক তৃতীয়াংশ (৩০%) লোক ছোট খাট ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামগুলিতে ব্র্যাক ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক, অক্সফাম ও বিআরডিবি কাজ করে। ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে মহাজনী ঋণের সুদে জর্জরিত হয়ে অনেকেই সম্পূর্ণ জমি বিক্রি করে দিয়েছে এবং অনেকেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বের এবং পরের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা

* ১৯৯৫ সালের একটি গবেষণা প্রতিবেদন। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উল্লাহ্‌

গেছে, পূর্বের তুলনায় মহাজনী, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনেক কমে গেছে। মহাজনী ঋণের সুদের হারও পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে। ঋণের টাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এখন ভোগরে জন্য টাকা কম খরচ করে এবং ব্যবসা, কৃষি কাজ ও অন্যান্য আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে টাকা বিনিয়োগ বেশি করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ২৭% লোক ব্র্যাক ঋণ ভোগ করেছে কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিয়ে ভোগ করে না। তারা কৃষি কাজ এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করে।

ব্র্যাকের ঋণ নিয়ে ৯৪% লোকের উপকার হয়েছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই বলেছে, ব্র্যাকের ঋণের সুদ অনেক কম দিতে হয় এবং ঋণের টাকা কাজে লাগিয়ে তাদের সংসারে আয় বেড়েছে। তা ছাড়া প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সঞ্চয় হচ্ছে। মাত্র ৬% লোকের উপকার হয়নি, কারণ হিসাবে জানা গেছে ঋণ নিয়ে জমি চাষ করে কিন্তু ফসল নষ্ট হয়ে যায়। আবার ঋণের টাকা নিয়ে কোন আয়মূলক কাজে ব্যয় করেন নাই।

চাষাবাদের কাজ পুরুষের হলেও ব্র্যাকের ঋণ নিয়ে মহিলারা কিছু কিছু চাষাবাদ করছে। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় ভোগের জন্য টাকা খরচ করেছে কম এবং ৩২% মহিলা যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছিল সে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেছে। সে ক্ষেত্রে মাত্র ১৪% পুরুষ ঋণের প্রকৃত ব্যবহার করেছে। স্কীমের সঠিক ব্যবহার কম হয়েছে।

কয়েকটা কেইস স্টাডিতে দেখা গেছে, অনেক মহিলাই পূর্বে ঋণ করে ও জমি বিক্রি করে সংসার চালিয়েছে কিন্তু ব্র্যাক কার্যক্রম চালু হওয়ার পর প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ব্র্যাক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে অনেকে ইরি ধান চাষ করার জন্য মহাজনী ঋণের সুদ দিতে গিয়ে তাদের লোকসান হতো, আবার ব্যবসার জন্য এ ঋণ নিয়েও লাভ হতো না। ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে গিয়ে দালালের হাতে পড়ে ঋণের প্রায় অর্ধেক টাকা দিয়ে দিতে হতো।

ব্র্যাক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বের এবং পরের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, মহাজনী ঋণ, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনেক কমে গেছে এবং মহাজনরা তাদের সুদের হার অনেক

কমিয়ে দিয়েছে। ব্র্যাক প্রদত্ত ঋণ ব্যবসা, কৃষিকাজ বা অন্যান্য আয়মূলক কাজে ব্যয় করছে। মাত্র ৬% পুরুষ ও মহিলা বলেছে ব্র্যাকের ঋণ নিয়ে উপকার হয়নি। কারণ ঋণ নিয়ে জমি চাষ করার পর ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং কেউ কেউ ঋণ নিয়ে টাকা আয়মূলক কাজে লাগাতে পারেনি।

মহিলা প্রধান খানার সমস্যাসমূহ*

নাওমী হোসেন ও সামিহা হুদা

ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি যৌথ গবেষণা প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার মতলব থানায় এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এ গবেষণায় অতি দরিদ্র মহিলাদের সমস্যার দিকে বেশি নজর দেয়া হয়েছে এবং এসব মহিলাদের বেশির ভাগই ব্র্যাক কর্মসূচিতে গ্রহণযোগ্য। এ গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মহিলা খানা প্রধানরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তা খতিয়ে দেখা এবং সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করা।

বাংলাদেশের অন্যান্য পল্লী অঞ্চলের মতো মতলব এলাকাও একটি কৃষি প্রধান এলাকা। আইসিডিডিআর,বি যদিও এখানে ১৯৬১ সাল থেকে কাজ করে আসছে তবুও তাদের কার্যক্রম মূলতঃ স্বাস্থ্য ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্র্যাক এ এলাকায় ১৯৯২ সাল থেকে ঋণ, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাজ করে আসছে। ছ'মাস ধরে তিনটি গ্রামের ১৮ জন বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলা খানা প্রধানদের অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তাদের সমস্যা উপলব্ধি করার চেষ্টা করা হয়।

কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণে মহিলারা খানার প্রধান হয়ে থাকেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিধাবা মহিলারাই খানা প্রধান হয়ে থাকেন। গবেষণায় দেখা যায়, সংশিষ্ট মহিলা খানা প্রধানদের শতকরা ৫০ ভাগই বিধবা। এরা নানা কারণে স্বামীগৃহ ছেড়ে বাবার বাড়িতে বা ভাইদের কাছে ফিরে যেতে পারেননি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাবা বা ভাইয়েরা অত্যন্ত দরিদ্র বিধায় এসব মহিলা ইচ্ছা থাকলেও বাবা বা ভাইদের কাছে ফিরে যাননি।

কারণ তারা পিতা বা ভাইয়ের ঘরে গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাননি। এছাড়া স্বামীগৃহে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে এবং সন্তানদের জন্মস্থান হওয়ার ফলে তাদের যে মায়া গড়ে ওঠে তা কাটিয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করা

---

* Summary of the RED research report entitled 'Problems of women headed households' by Naomi Hossain and Samiha Huda. 1995. 56p. (Summarized in Bangla by Khalid Hassan)

সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে খানা প্রধান হতে বিধবা মহিলারাই সামাজিকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন। সামাজিক সহায়তা ও নিরাপত্তাও বেশি লাভ করেন। কিছু কিছু মহিলা অত্যাচার, নির্যাতন, অবহেলা অথবা সতীনের উপস্থিতি সহ্য করার চাইতে একাই জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন। সাধারণতঃ বৈবাহিক সম্পর্কে চিড় ধরা এবং অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে এসব মহিলা পরিত্যাক্ত হয়ে পড়েন। তবে অল্প বয়স্ক বিধবারা সাধারণতঃ পিতৃগৃহে ফিরে যান। এসব পরিত্যাক্ত মহিলা খানা প্রধানরা সাধারণত তাদের পিতৃকূল থেকে সহায়তা লাভ করে থাকেন। সমাজ এদের প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না। এছাড়া যে সকল শ্রমিক দুরে গিয়ে কাজ করে তাদের স্ত্রীরা সাধারণত তাদের স্বামীদের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী ভাবে খানা প্রধান হয়ে থাকেন।

পর্দা প্রথা এ ধরনের মহিলা খানা প্রধানদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। দারিদ্র্য হচ্ছে এসব মহিলা খানা প্রধানদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা। মহিলা খানা প্রধানরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি বা সম্পদের উপর থেকে প্রায়শঃই তাদের অধীকার হারিয়ে ফেলেন। অভাবের তাড়নায় কয়েকজন মহিলা খানাপ্রধান স্বামীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি, জমি এমনকি থালাবাটি পর্যন্ত বিক্রি করে ফেলেছেন। যদিও তারা উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিকানা লাভ করেন, এর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে খুবই পরোক্ষ। মাঠে গিয়ে জমি চাষ করা থেকে তারা তাদের ভাই বা শ্বশুড় বাড়ির অন্য কোন পুরুষ দিয়ে চাষাবাদ করানোর পক্ষপাতী।

মহিলা খানা প্রধানদের জন্য সামাজিক যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে বাস্তবে এসব মহিলা খানা প্রধানরা সে ধরনের কোন সহায়তা লাভ করেননি। আত্মীয়স্বজনরা দারিদ্র্যের কারণে এসব মহিলা খানা প্রধানদের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি বা তাদেরকে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্যও করতে পারেননি।

পল্লী এলাকার মহিলা খানা প্রধানরা ব্যাপকভাবে দারিদ্র্যের শিকার হন। পুরুষ প্রধান সমাজে এসব মহিলাদের জন্য বিষয়টি আরও মারাত্মক হয়ে দাড়ায়। প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা বা কল্যাণ ব্যবস্থা তাদের সহায়তা নিশ্চিত করতে পারে না এবং শুধুমাত্র মহিলা হওয়ার কারণে কর্মক্ষেত্রে তাদের সুযোগ অতটা থাকে না। তাদের জন্য খুব কমসংখ্যক কাজই পাওয়া যায় এবং একই সাথে তারা আবার অদক্ষ।

পর্দা প্রথা এবং প্রাপ্ত কাজের জায়গা দূরে হওয়ার কারণেও এসব মহিলা কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

মহিলা খানা প্রধানদের মধ্যে কারা ব্র্যাকের সদস্য হবে অথবা হবে না তার কোন সুনির্দিষ্ট পার্থক্য চিহ্নিত করা কঠিন। ব্র্যাকের সদস্য হওয়া বা না হওয়া তার একার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল না, বরং পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের এই গবেষণার অধীনে দুইজন মহিলা খানা প্রধান ড্রপ আউট ছিল। একজন সদস্য পদ ত্যাগ করেছে এ কারণে যে, তার সঞ্চয় চালাতে পারছিল না। অপরজন, যার স্বামী গ্রামে বাইরে থাকে তার অসম্মতির কারণে ব্র্যাক ছেড়ে চলে গেছে।

এসব মহিলাদেরকে অন্যদের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সহায়তা করে থাকে। যে সব মহিলা খানা প্রধান ব্র্যাক কর্মসূচির সাথে জড়িত নয় তাদের চেয়ে যারা জড়িত তারা কাজের সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই বেশি লাভ করেন।

এছাড়াও প্যারালিগ্যাল, মানবাধিকার এবং আইন শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ব্র্যাক এসব মহিলা খানা প্রধানদেরকে সহায়তা দিতে পারে। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং পারিবারিক আইন সম্পর্কে একটি প্যাকেজ ব্যবস্থা এসব মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

মহিলাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়নি ফলে মহিলা খানা প্রধানরা মারাত্মক ঝুঁকির মুখোমুখী হচ্ছেন। তাদের নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এসব মহিলাদের জন্য কিছু ভিন্ন ধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কোন কোন ক্ষেত্রে ব্র্যাকের ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা শুরু করতে এসব মহিলাদের অনাগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া ব্র্যাক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য সঞ্চয়ের নিয়ম পালন এসব দারিদ্র মহিলার পক্ষে সম্ভব হয়না ফলে তারা ঋণ গ্রহণও করতে পারেন না। তাই ব্র্যাক তাদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে এবং কাজ পাওয়ার ব্যাপারে এসব মহিলা খানা প্রধানদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

এছাড়াও তাদেরকে ব্র্যাকে যোগদানে উৎসাহিত করতে হবে যাতে ব্র্যাক তাদের সমস্যা সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বিবেচনা করতে পারে। এতে তাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশীদার করে নেয়া যাবে।

গ্রাম সংগঠন সদস্যদের সঞ্চয়ী অর্থের ব্যবহার*

ফারাহ্ দীবা ও ইশরাত আরা

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্যদেরকে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা রাখতে হয়। কোন কারণে সংগঠনের সদস্য আর থাকতে না চাইলে সঞ্চিত অর্থ তুলে নেয়া যায়। সদস্যদের সঙ্কটকালে কিভাবে তাদে অর্থের চাহিদা মেটাবে তার পর্যালোচনা ও সমাধানের লক্ষ্যে সমীক্ষাটি হাতে নেয়া হয়। এছাড়াও , সংগঠনের সদস্যদের প্রয়োজনে কিভাবে স্বীয় সঞ্চয়ী অর্থ থেকে সহায়তা করা যেতে পারে, তার একটা স্কীম দাঁড় করিয়ে এ সমীক্ষায় তার একটি পথ খোঁজার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সংগঠনের সদস্যদের উন্মুক্ত সঞ্চয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং তা থেকে বিশেষ প্রয়োজনে আংশিক ঋণ উত্তোলনের ব্যাপারে মতামত সংগ্রহ ইত্যাদি হল এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

রাজশাহী জেলার পবা ও মোহনপুর এবং নরসিংদী জেলার মাধবদি ও আমদিয়ার এই ৪টি এরিয়া অফিসের প্রতিটি থেকে ৪টি করে মোট ১৬টি গ্রাম সংগঠনে এই সমীক্ষা পরিচালিত হয়।

জানা গেছে, আশা এবং গ্রামীণ ব্যাংকে শর্তাধীনে সঞ্চয় ঋণ প্রদানের নীতি চালু রয়েছে। এই সঞ্চয় ঋণ-এর ব্যাপারে সদস্যদের মধ্যে প্রথমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সদস্যদের যখন বোঝানো হয় যে, এই সুদ তাদের সঞ্চয় হিসাবেই জমা হবে এবং এর জন্য কোন সার্ভিস চার্জ দিতে হবে না, তখন অধিকাংশ সদস্যই এই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে একমত হয় যে, প্রয়োজনে কিংবা জরুরী অবস্থায় সঞ্চয় থেকে ঋণ নেয়ার অধিকার সবার থাকবে।

---

* Summary of the RED research report entitled 'Anote on providing access to savings of VO members' by Farah Deeba and Ishrat Ara. 1995 November. 25p. (Summarized in Bangla by Md. Azizul Haque.)

ঋণের উপর সুদ প্রদান ব্যবস্থাকে অধিকাংশ গ্রাম সংগঠন সমর্থন জানিয়েছে। কারণ যারা ঋণ নিয়েছে এবং যারা ঋণ নেয়নি তাদের সঞ্চয়ী অর্থ একই হারে বৃদ্ধি পেয়ে নিজ নিজ হিসাবেই জমা হতে থাকে। সুদ পরিশোধের ব্যাপারে অধিকাংশ সদস্যই একমত হয় যে, সঞ্চয় ঋণ গ্রহণের ৬ মাসের মধ্যে সপ্তাহ ভিত্তিতে সুদ পরিশোধ করতে হবে।

পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আরডিপি) আঞ্চলিক অফিসের কর্মীবৃন্দ স্কীমটির বিভিন্ন সুবিধাদির কথা ব্যক্ত করেছে, যেমন সঞ্চয় বৃদ্ধি, ব্র্যাকের সুনাম এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, সংকটকালে সহায়ক ভূমিকা প্রভৃতি। তেমনি কিছু অসুবিধার কথাও ব্যক্ত হয়েছে যেমন, এতে অফিসে কাজের চাপ বাড়বে ফলে ব্যবস্থাপনার মান ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি।

জরুরী প্রয়োজন মেটাতে সদস্যদের জন্য নিজ নিজ সঞ্চয়ী হিসাব থেকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সর্বাগ্রে সঞ্চয় ঋণ প্রদান পদ্ধতির জনপ্রিয়তা আছে কিনা তা দেখা দরকার। সঞ্চয় ঋণ যথাসম্ভব সুদমুক্ত রাখা আবশ্যক।

পাইলট সঞ্চয় ঋণ প্রকল্পটি ৩ বৎসর মেয়াদে কমপক্ষে ৩০টি ব্রাঞ্চে চালু থাকা বাঞ্ছনীয় । গ্রাম সংগঠন সদস্যদেরকে পাইলট স্কীমটির প্রাসঙ্গিক সব তথ্যাবলী বিশদভাবে জানাতে হবে। সঞ্চয়ী ঋণ নিয়ে তার দ্বারা যাতে কোন বকেয়া বা চলতি ঋণ পরিশোধিত না হয়, সে ব্যাপারে ব্র্যাক কর্মীদের সচেতন থাকতে হবে।

ব্র্যাকের ঋণদান পদ্ধতি একটি টেকসই ব্যবস্থা। তাই প্রস্তাবিত সঞ্চয় ঋণ ব্যবস্থায় সমীক্ষাটির সুপারিশগুলি কার্যকর করলে বিশেষ পরিস্থিতিতে সংগঠন সদস্যগণ উপকৃত হবে। ব্র্যাকের সুনাম এবং তার কর্মী তথা সদস্যবৃন্দের কর্মোদ্যম বৃদ্ধি করার স্বার্থে সঞ্চয়ী ঋণ ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা যেতে পারে।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের উপর মহিলাদের মজুরিভিত্তিক কাজ ও ঋণের প্রভাব*

মাহমুদা রহমান খান

বাংলাদেশে নারী-পুরুষ বৈষম্য শুরু হয় শিশুর জন্মলগ্ন থেকে এবং তা চলতে থাকে সারা জীবন ধরে। কিন্তু সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, উপুর্যপুরি ভূমিহীনতা, দারিদ্র্য ও কাজের উদ্দেশ্যে পুরুষদের স্থানান্তরের কারণে অধিক সংখ্যক মহিলা শ্রম বাজারে ঢুকে পড়ায়, গতানুগতিক নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ অবস্থায় গ্রাম উন্নয়নে এনজিওগুলো মহিলাদের কর্মসংস্থান, ঋণ দান ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখন ধীরে ধীরে নারী-পুরুষের মধ্যে এ বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। দারিদ্র্য ও ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়তে থাকায় চাকরির খোঁজে পুরুষরা বিদেশমুখী হচেছ এবং অধিক সংখ্যক মহিলা শ্রম বাজারে ঢুকে পড়ছে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এই দুটি মূল লক্ষ্য নিয়ে ব্র্যাক কাজ করছে। পাশাপাশি ব্র্যাক মহিলা সংগঠন ও ফাউন্ডেশন গড়ে তুলছে যেমন, আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন। ১৯৯৪ পর্যন্ত মানিকগঞ্জ, জামালপুর ও যশোরে তিটি ফাউন্ডেশন রয়েছে। এ নিবন্ধটি জামালপুরের আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনে জড়িত মহিলাদের জরিপের ভিত্তিতে রচিত করেছে। জামালপুর আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের অধীনে ৪১টি উপকেন্দ্রে ২,২০০ মহিলা জড়িত আছে।

ব্র্যাকের লক্ষীভূত জনগোষ্ঠীর জীবনের উপর তাদের মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রভাব কি রকম, আয়-ব্যয়ের ধরন, পরিবারে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, মজুরিভিত্তিক কাজের লাভ-ক্ষতি, তাদের জীবনধারায় পরিবর্তন, সামাজিক অবস্থান, তাদের কাছে ক্ষুদ্র ঋণের চাহিদা, ঋণের ব্যবহার ও পরিশোধ পদ্ধতি ইত্যাদি খুঁজে বের করার জন্য এ সমীক্ষাটি হাতে নেয়া হয়।

---

* Summary of RED research report entitled ‘The effects of wage employment and credit for women in Bangladesh’ by Mahmuda Rahman Khan. 1995 July. 43p. (Summarized in Bangla by Quazi Faruque)

আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনসহ ৭টি উপকেন্দ্রের ৩৪১ জন মহিলার উপর জরিপটি চালানো হয়েছে। এদের মধ্য থেকে ৩০ জন মহিলাকে বাছাই করে তাদের পরিবারের সহায়ক ব্যবস্থা ও নারী-পুরুষ সম্পর্কের পরিবর্তন বিষয়ে জানতে তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এছাড়া পারিবারিক বিনিয়োগ ও ভোগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং মহিলাদের মজুরিভিত্তিক কাজের লাভ লোকসান সম্পর্কে তাদের ধারণা কি তা বের করার জন্য ১৪ জন মহিলা ও ১৪ জন পুরুষ সমন্বয়ে ৪টি ফোকাস গ্রুপ পর্যায়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

ফলাফলে দেখা গেছে, গ্রামের দরিদ্র মহিলারা ব্র্যাক ও ফাউন্ডেশনের উপকেন্দ্রে এগিয়ে আসছে মজুরিভিত্তিক কাজ করতে । তারা এমব্রয়ডারী কাজে বেশি জড়িত হচ্ছে এবং মাসে ৫০০-১২০০ টাকা আয়ের নিশ্চয়তা পাচেছ। এই কাজে অল্পবয়সী অবিবাহিত মেয়েরাই ভাল করছে। কেন্দ্রের ইনচার্জ এক হাজার টাকা বেতন ছাড়াও বিক্রয়ের উপর কিছু কমিশন (৪%) পেয়ে থাকে। তার নিজের কর্মক্ষম মেয়ে থাকলেও এখানে কাজে লাগাতে পারে। অনেক তালাকপ্রাপ্তা মহিলা বাবা-মার সংসারে গলগ্রহ হয়ে না থেকে এ কাজে নিয়োজিত হয়েছে। অবিবাহিত মেয়েদের অর্থনৈতিক অবদানের জন্য সংসারে তাদের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। যৌতুকের প্রচলন এখনও বর্তমান তবে তার পরিমাণ কিছুটা কমেছে, তার কারণ এই কর্মসংস্থানকেই অনেক ক্ষেত্রে যৌতুক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

গৃহবধুরা রোজগার ঘরে আনতে পারায় সংসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অবস্থান শক্ত হয়েছে। স্বামীর কাছেও স্ত্রীর এই অর্থনৈতিক অবদান মূল্য পেয়েছে। মহিলারা এই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মমতাবোধ অর্জন করেছে এবং এর ফলে কলহ, খুনসুটি কমেছে। এই মতামত শুধুমাত্র যে মহিলারা ব্যক্ত করেছে তা নয়, পুরুষরাও একই মতামত পোষন করে। পুরুষদের মতে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সমান দায়িত্ব এবং দুজন আয় না করলে জীবন ধারণ করা কঠিন। মহিলারা আয় করে মাঝে মাঝে নিজেদের কাপড়-চোপড় কেনে তাতে পুরুষদের আপত্তি নেই। তারা তাদের স্বামীদের জন্য কাপড়-চোপড় কিনে দেয়, সংসারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে দুজনের আয় থেকে খরচ করা হয়। কিন্তু মহিলারা তাদের আয়ের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে পুরুষদের হাতে সমর্পন করে না অন্যদিকে কিছু পুরুষ মনে করে মহিলাদের পুরো আয় তাদের কাছে দেয়া উচিত যাতে পুরুষরা নির্ধারণ করতে পারে কিভাবে সেই টাকা খরচ হবে।

কোন কোন স্বামীরা এও বিশ্বাস করে যে যেহেতু এখন তাদের স্ত্রীরা তাদের সেবা করেনা তাই তাদের আয় স্বামীদের হাতে দিয়ে দিবে। তবে তারা এও স্বীকার করে যে, মহিলাদের সেলাই কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি। বিশেষ করে ঈদের সময়, যার ফলে তাদের বাড়ির বাইরে ও ভিতরে এই দ্বৈত কাজ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের কথা থেকে বোঝা যায়, অনেক সময় মহিলারা তাদের স্বামীদের যৌন চাহিদা মেটাতে সময় দিতে অপারগ। অন্যদিকে মহিলারা বাড়িতে রাত জেগে সেলাইর কাজ করে শুধুমাত্র টাকা আয় করার জন্য নয় বরঞ্চ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য। এতে তারা রাতে বাড়ির কাজ শেষে সেলাই কাজে মনোনিবেশ করে এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা স্বামীর জৈবিক চাহিদা অগ্রাহ্য করার সুযোগ পায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ধরেই নেওয়া হয় যে স্বামীরা যখনই ইচ্ছা করবে তখনই তাদের জৈবিক চাহিদা মিটাবার জন্য স্ত্রীদের পাওয়া যাবে, এক্ষেত্রে স্ত্রীর ইচছা অবিবেচ্য। সেই ক্ষেত্রে বলা যায় এই মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান মহিলাদের স্বামীর সাথে দৈহিক মিলনের সময় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়তা করছে। যদিও কাপড় ধোয়া, বাচ্চা-কাচ্চার যত্ন ও সাংসারিক বিভিন্ন কাজে বিঘ্ন ঘটছে। স্বামীকে সময় দেয়া বা অনেক সখের কাজ বাদ দিয়ে জৈবিক চাহিদার জন্য দৈনন্দিন রুটিন করে নিতে হচ্ছে। কাপড় ধোয়া, বাচ্চা-কাচ্চার যত্ন, পানি আনাসহ ও অন্যান্য সাংসারিক কাজেও বাড়ির পুরুষরা সাহায্য করছে। কিন্তু এই সাহায্য পুরোপুরি নির্ভর করে পুরুষের কাজের ধরনের উপর।

সর্বোপরি, মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের জীবনধারায় এনেছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন। তারা এখন ভালো খেতে-পড়তে পারছে। ছেলেমেয়েকে লেখাপড়াও শেখাতে পারছে। এখন সমাজে যৌতুক কমেছে। তাছাড়া আয় করা অর্থের কিভাবে সদ্ব্যবহার করা যায় সেই চেতনাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। তারা সঞ্চয়ের ধরণা পেয়েছে এবং ঋণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পেরেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আরডিপি) ঋণ আদায়ের হার সন্তোষজনক। তবে যে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ঋণ দেয়া হয়, সব সময় ঐসব উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হয়নি। দেখা গেছে, ২৪০ জন মহিলার মধ্যে অধিকাংশই (১৬০ জন) যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। দেখা গেছে, ২৫ জন মহিলা কিনেছে রিক্সা, ৪০ জন তাদের ঋণের

টাকা গৃহাস্থলির কাজে যেমন ঘর বানানো, টিউবওয়েল বসানো, বন্ধকী জমি ছাড়ানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে। ১৫ জন মহিলা ঋণের টাকা দিয়ে খাবার কেনা, কাপড়-চোপড় কেনা ইত্যাদি করেছে। মোটকথা যে উদ্দেশ্যে ঋণ নেয়া হয়েছিল, শতকরা ৪০ ভাগ ঋণ সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারা পারিবারিক আয় বাড়াতে তাদের স্বামীদের মাধ্যমে এই ঋণ ব্যবহার করেছেন।

দেখা গেছে, মহিলারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমব্রয়ডারী কাজের আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করে থাকে। এছাড়াও স্বামীদের রিক্সার আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে। পারিবারিক বাগানে উৎপাদিত শাক-সবজি অথবা দুধ-ডিম বিক্রি করেও ঋণ পরিশোধ করছে তারা। উপকেন্দ্রে মজুরিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত এক চতুর্থাংশের কিছু বেশি মহিলা ব্র্যাক ঋণ গ্রহণ করে না। গবেষণায় দেখা গেছে, ২৯ শতাংশের পরিশোধ করার মতো আয়ের কোন ব্যবস্থা নেই এবং ১৯% এর ঋণ ব্যবহারের মতো সময় ও জনবলের অভাব রয়েছে।

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী মজুরিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত ৬৩% মহিলা ব্র্যাকের ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে জীবন যাপনের মান উন্নত করার চেষ্টা করছে। ব্র্যাক ঋণের টাকা কিভাবে খাটানো যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বামীর সাথে বা পরিবারের অন্য কর্তাব্যক্তির সাথে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা সংসারের কল্যাণে ব্যয়ের ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। স্বামীর কাছে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অবদান মূল্য পেয়েছে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার কলহ, অত্যাচার, নির্যাতন কমেছে। মজুরিভিত্তিক কাজের সুবাদে মেয়েরা বিয়ে ও যৌতুক প্রশ্নে নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে। এ কাজ সবক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এনে দিয়েছে। তাই এমন পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে কাজের সুযোগ বেড়ে যায়। পাশাপাশি কিছু কর্মসূচিভিত্তিক ও নীতিগত সুপারিশ বাস্তবায়ন করা বাঞ্ছনীয় যেমন, ঋণ আরো সহজলভ্য করা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানো উচিত। উপকেন্দ্রে শিশু পরিচর্যার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কাজের পরিবেশ আরো উন্নত করতে হবে। শিক্ষার উপর আরো গুরুত্ব দিতে হবে। নারী শিক্ষার ব্যাপারে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে ও সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের জন্য উৎসাহ যোগাতে হবে যার অভীষ্ট গোষ্ঠী হবে গ্রামের দরিদ্র মহিলারা। এর ফলে তারা তাদের আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

ঋতু ভেদে গ্রামীণ দরিদ্রদের খাদ্য গ্রহণের তারতম্যঃ একটি সমীক্ষা*

করিমুল হক

পুষ্টিহীনতা একটি বিশ্বজনীন সমস্যা। সারা পৃথিবীতে পুষ্টিহীনতার শিকার প্রায় ৪৫ কোটি ৮০ লক্ষ লোক। এর কারণগুলোর মধ্যে অপর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ, সীমিত ক্রয়ক্ষমতা, স্বল্প আয় ইত্যাদি অন্যতম। পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচতে হলে প্রয়োজন সুষম খাদ্য ও নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরী গ্রহণ। বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার প্রকোপ বিশেষ বিশেষ মৌসুমে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ সমীক্ষায় ভরা ও মন্দা এই দুই মৌসুমে ব্র্যাক সদস্য ও অসদস্যদের পুষ্টি গ্রহণের তারতম্য দেখা হয়েছে। ভরা মৌসুমে ব্র্যাক সদস্যরা গড়ে প্রতিদিন যে পরিমাণ কিলোক্যালরী পাচ্ছে, যারা সদস্য নয় তারা পাচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম। অথচ একজন মানুষকে সুস্থ থাকতে হলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিলোক্যালরী গ্রহণ করতে হয় (প্রতিদিন কমপক্ষে ২,৩১০ কিলোক্যালরী)। ফলে ব্র্যাক সদস্য ও অসদস্যদের শরীরে ক্যালরীর ঘাটতি রয়েছে। মৌসুম ভেদে এই ঘাটতির তারতম্যও লক্ষ্য করা যায়।

ভরা ও মন্দা মৌসুমে ব্র্যাক সদস্য ও অসদস্যদের খাদ্যাভ্যাস পরীক্ষা করা ও উভয় মৌসুমে ব্র্যাক সদস্য ও অসদস্যদের খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের ক্ষেত্রে তারতম্য দেখার জন্য এ গবেষণাটি হাতে নেয়া হয়। এছাড়াও, ব্র্যাকের লক্ষীভূত গোষ্ঠী ও লক্ষ্য বহির্ভূত গোষ্ঠীর উপর খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণে ঋতুর প্রভাব নির্ণয় করাও এ গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য যশোর ও জামালপুর জেলার কর্মসূচিভুক্ত গ্রামগুলোকে বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত গ্রাম থেকে ব্র্যাক সদস্য ও অসদস্য মিলে মোট ৪৫৯ টি খানা নির্বাচন করা হয়। এসব খানায় ব্র্যাকের লক্ষীভূত সদস্য ছিল ১,৮৬৫ জন। লক্ষীভূত খানাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমতঃ যারা ব্র্যাকে যোগ দিয়েছে, এবং দ্বিতীয়তঃ যারা যোগ দেয়নি তবে ব্র্যাকের সংজ্ঞা অনুযায়ী যোগ দেওয়ার যোগ্য। এ সমীক্ষার জন্য আমন ধান ওঠার পূর্বে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-নভেম্বর (১৯৯১) এবং আমন

---

* Summary of the RED research report entitled "Vulnerability of the rural poor to seasonal fluctuations in food comsumption: findings from longitudinal data" by Karimul Huque. 1995 February. 16p. (Summarized in Bangla by Noor Jahan Akter Shetoo)

ধান ওঠার পরে অর্থাৎ নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি (১৯৯১-৯২) পর্যন্ত ঐ সকল খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সমীক্ষায় আমন ধান ওঠার পরবর্তী সময়কে ভরা মৌসুম বলা হয় এবং আমন ধান ওঠার পূর্বের সময়টাকে মন্দা মৌসুম ধরা হয়। দেখা গেছে, ভরা মৌসুমে গ্রামীণ জনসাধারণের কাজের সুযোগ ও খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ভরা মৌসুমে ব্র্যাক সদস্যরা গড়ে দৈনিক ৭২৭ গ্রাম পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে যার শতকরা ৭২ ভাগ রুটি বা ভাত জাতীয় খাদ্য, সাত ভাগ সবজি ও শতকরা ১৬ ভাগ শষ্য জাতীয় খাদ্য। দেখা গেছে, ঐ মৌসুমে অসদস্যরা তার চেয়ে কম (৬৫৫ গ্রাম) গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করে। মন্দা মৌসুমে এ হারের আবার ভিন্নতা দেখা যায়। এ সময়ে ব্র্যাক সদস্য দৈনিক গড়ে ৬৬২ গ্রাম ও অসদস্য ৬০২ গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করে যার তিন চতুর্থাংশ রুটি বা ভাত জাতীয় খাদ্য। দেখা গেছে, সব মৌসুমেই অসদস্যদের চেয়ে সদস্যরা গড়ে দৈনিক খাদ্য গ্রহণ বেশি করে। আবার দেখা গেছে, ভরা মৌসুমে ব্র্যাক সদস্য ও অসদস্য উভয়ের অবস্থাই মন্দা মৌসুমের চেয়ে ভাল। মন্দা মৌসুমে কাজ কর্মের সুযোগ কম থাকে ও পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না। যে খাদ্য কম দামে পাওয়া যায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী সেটা পুষ্টিকর কিনা সে বিচার না করেই খেয়ে থাকে। দেখা গেছে, ভরা মৌসুমে ব্র্যাক সদস্যরা অসদস্যদের চেয়ে একটু বেশি আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। মন্দা মৌসুমেও সদস্যদের অবস্থা অসদস্যদের চেয়ে অনেক ভাল। ক্যালরী গ্রহণের বেলায়ও অসদস্যদের চেয়ে সদস্যদের অবস্থা ভাল। তবে লক্ষ্যণীয় যে, মন্দা মৌসুমে অসদস্য ও সদস্য উভয়েই ক্যালরী ও আমিষ জাতীয় খাদ্য কম গ্রহণ করে থাকে। ব্র্যাক সদস্যরা ভরা ও মন্দা মৌসুমে যথাক্রমে ২,২০৭ ও ২,০০৭ কিলোক্যালরী গ্রহণ করে কিন্তু অসদস্যরা ভরা ও মন্দা মৌসুমে যথাক্রমে ২,০০৯ ও ১,৮২৭ কিলোক্যালরী গ্রহণ করে। উভয় মৌসুমেই ব্র্যাক সদস্যদের মোট আমিষ ও ক্যালরী গ্রহণের একটি বিরাট অংশ আসে ভাত জাতীয় খাদ্য থেকে। ভরা মৌসুমে সদস্যদের প্রাপ্ত মোট ক্যালরীর ৮২% ও মন্দা মৌসুমে সদস্যদের প্রাপ্ত মোট ক্যালরীর ৮৬% আসে ভাত বা চাল থেকে। অসদস্যদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ভরা মৌসুমে ৮৫% ক্যালরী আসে ভাত থেকে। অর্থাৎ ভরা মৌসুমে সদস্যদের শুধুমাত্র ভাত থেকে প্রাপ্ত ক্যালরী মন্দা মৌসুমের চেয়ে একটু কম তবে ভরা মৌসুমেও অসদস্যের ক্যালরী বেশিই আসে ভাত থেকে।

মোট কথা হল, ব্র্যাক সদস্য ও অসদস্যরা প্রতিদিন গড়ে যে ক্যালরী গ্রহণ করে তা স্বাস্থ্য রক্ষার সর্বনিম্ন পরিমাণের চেয়েও অনেক কম।

উপসংহার

বিভিন্ন ধরনের খাদ্যে বিভিন্ন পরিমাণ পুষ্টি থাকে। শরীর গঠনে ও শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখতে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই ফসলাদির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে গ্রামীণ এলাকায় প্রায়ই খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এর সাথে গ্রামীণ মানুষ পুষ্টিহীনতারও শিকার হয়। সমীক্ষাধীন জনগোষ্ঠীর পুষ্টি বেশিরভাগই ভাত জাতীয় খাদ্য থেকে আসে। তাই পুষ্টিহীনতা হ্রাস ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন, ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন কোর্স চালু করা প্রয়োজন এবং আরডিপির ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে হলে এটা অবশ্য পালনীয় একটি শর্ত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং আরডিপি সুবিধাভোগীদের সুষম খাদ্যের গুরুত্ব ও খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্যের বহুমুখীকরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

দরিদ্রদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের জন্য দক্ষতামূলক কাজের সুযোগ করে দেয়া প্রয়োজন কারণ তাদের মাথাপিছু পুষ্টি মান বাড়াতে হলে তাদের আয় ও বাড়াতে হবে।

লক্ষীভূত জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণে আর. আর. এ পদ্ধতি প্রয়োগঃ লালমনিরহাট সদর থানার একটি সমীক্ষা*

মোঃ নূরুল আমিন, মোঃ আলতাফ হোসেন, মোঃ আজমল কবির কাজল, শামীম আরা বেগম ও পারুল লতা বিশ্বাস

র‍্যাপিড রুরাল এ্যাপ্রাইজাল বা ত্বরিত গ্রাম সমীক্ষা (আর আর এ) পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্র্যাক কর্মসূচির জন্য গোষ্ঠীভুক্ত পরিবার বাছাই করার লক্ষ্যে এই জরিপ পরিচালিত হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক, সঠিক এবং স্বল্প সময়ে লক্ষীভূত জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা যায়।

এর আগে আরো কয়েকটি গবেষণায় আর. আর. এ এবং পারটিসিপেটরী রুরাল এ্যাপ্রাইজাল (পি আর এ) পদ্ধতি প্রয়োগ করে ইতিবাচক ফল পাওয়ার পর ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বা আরডিপি যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আরডিপি'র নতুন এলাকা অফিসের লক্ষ্যগোষ্ঠী নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করবে। এরপর লালমনিরহাটের সদর থানায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ কাজের জন্য একটি household information card তৈরি করা হয় এবং এলাকার মানচিত্রকরণ, সম্পদের স্তর নির্ধারণ ও খোলাখুলি মত বিনিময় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

লালমনিরহাট জেলার সদর থানার ৭২ টি গ্রাম এবং পৌরসভার ৫টি পাড়ার ২৪,২৪৪ টি পরিবারকে জরিপের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। জরিপ এলাকার মানচিত্রকরণ, ভূমি সম্পদের স্তর নির্ধারণ এবং খোলাখুলি মত বিনিময়ের কৌশল প্রয়োগ করে ২৪,৩৬২ টি (৬৯.২%) পরিবারকে লক্ষ্যগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশ পরিবার অন্য বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজেই বাকি ৯,৬০০ টি (২৯.৬%) পরিবার হচ্ছে প্রকৃত লক্ষ্যগোষ্ঠী। প্রায় একই সময়ে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরিচালিত পার্শ্ববর্তী একটি আরডিপি এলাকার জরিপের তথ্যের সাথে তুলনা করে লালমনিরহাটে পরিচালিত জরিপের তথ্য তুলনামূলকভাবে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে।

---

* Summary of the RED research report entitled "Use of RRA in identifying RDP target group: a pilot study in Lalmonirhat Sadar thana" by Md. Nurul Amin, et al. 1995 February. 19p. (Summarized in Bangla by Shahana Huda)

প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরিচালিত জরিপের ক্ষেত্রে প্রায়ই সব সময় জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যে কিছু বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু লালমনিরহাটের জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যে কোন ভুল বা বিভ্রান্তি পাওয়া যায়নি।

নতুন এলালায় লক্ষ্যগোষ্ঠী চিহ্নিত করার জন্য অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের মাধ্যমে জরিপ চালানো হয়েছে। লালমনিরহাটে ব্র্যাকের স্থায়ী কর্মীরাই জরিপ চালিয়েছে। এরা মাঠ পর্যায়ের কাজের মাধ্যমে গ্রামের লোকদের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত, গ্রামের ক্ষমতা কাঠামো এবং অন্য এনজিওর কাজের সঙ্গেও পরিচিত। জরিপ কাজে ব্র্যাকের স্থায়ী কর্মীদের অংশগ্রহণের ফলে এই পদ্ধতি ব্যবহারের খরচ তুলনামুলকভাবে কিছুটা বেশি বলে মনে হয়েছে কিন্তু লালমনিরহাটে লক্ষ্যগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণে গ্রামের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেছে। এর মাধ্যমে গ্রামবাসীরা বিশেষ করে গ্রামের গণ্যমান্য ও বয়স্ক লোকেরা ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জেনেছে। ব্র্যাক কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে গ্রামবাসীদের সাথে ব্র্যাকের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রাক আলোচনা অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক অপতৎপরতা রোধে অনেক সহায়ক বলে মনে হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ এবং সঠিক উপাত্তের পরিমাণ বেশি। ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য জনগণের অংশগ্রহণ এবং তাদের উপলব্ধিবোধ দরকার। কাজেই ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এই পদ্ধতিই বেশি উপযোগী।

গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশু শ্রম*

আব্দুলাহেল হাদী

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। গ্রামীণ দুর্বল অর্থনীতির কারণগুলো হচ্ছে অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, চাকুরি কিংবা কাজের সীমিত সুযোগ ইত্যাদি। দেখা গেছে, অর্ধেকের বেশি শ্রমজীবিরা কৃষি, মৎস্য ও বিভিন্ন খামারে কাজ করে। এই সকল শ্রমজীবিদের একটি বিরাট অংশ শিশু। ১৯৮৩ সালে এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের মোট শ্রমজীবিদের শতকরা ১৩ জনই শিশু শ্রমিক। ১০-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের মধ্যে শ্রমজীবিদের হার শতকরা ২৫ ভাগ। আর শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

শিশুদের কাছ থেকে বেশি শ্রম নিয়ে কম মজুরী দেয়া – শোষণের এ নৈমিত্তিক প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে আজও যা শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ও জীবানু শক্তি হ্রাসের কারণ। এতে দেশ মানব সম্পদের অভাবের সম্মুখীন হবে ক্রমান্বয়ে। শিশু শ্রমের বিরুদ্ধেও চলছে অনেক অভিযান, আছে আইন অথচ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে শিশু শ্রম বর্জন সম্ভব হয়ে উঠেনি। গ্রাম বাংলায় শিশু শ্রম ও তার কারণ নির্ণয়ের জন্য এ সমীক্ষা হাতে নেয়া হয়। ১৯৯৫ এর মার্চ মাসে বাংলাদেশের দু'টি জেলার ১৫০টি গ্রামের ৫-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গ্রাম বাংলায় শিশুদেরকে সাধারণত পশুপালন, ধান ভানা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, বাসার রান্না বান্নার কাজ করতে দেখা যায়। গ্রামে এ ধরণের কাজ যুগ যুগ ধরে শিশুদের দ্বারা করানো হচ্ছে। দেখা গেছে, শিশুদের প্রায় অর্ধেকই গ্রামের বিভিন্ন শ্রমের সাথে জড়িত। একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, পূর্ণদিবস কাজ করে এমন শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত কম (১.২%) এবং দিনে দুই ঘন্টা কাজ করে এমন শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। শ্রমিকের সংখ্যায় বালক ও বালিকার তেমন একটা পার্থক্য নেই, অর্থাৎ প্রায় সমান। শিশু শ্রমিকের তুলনায় কিশোর শ্রমিক গ্রামে কিছুটা কম।

---

* Summary of the RED research report entitled "Child labour in Bangladesh villages: incidence, correlates and implications" by Abdullahel Hadi, 1995 December. 8p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

ব্র্যাকের ১৯৯৫ সালে এক গবেষণায় দেখা যায়, স্কুলে ভর্তিকৃত বালকদের চেয়ে বালিকাদের সংখ্যা কম। কোন স্কুলে ভর্তি হয়নি এমন সব শিশুদের সংখ্যাই বেশি। কর্মক্ষেত্রে সময় দেওয়ার কারণে কিংবা বাবা মা'দের আর্থিক সংগতির অভাবে তারা তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠান না। দেখা গেছে, গ্রামে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বালক পশু পালনে শ্রম দেয় এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় সবচেয়ে কম সংখ্যক শিশু শ্রম দেয়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বালিকা চাকরানী কিংবা রান্না বান্নার কাজ করে। ক্ষুদ্র ব্যবসায় বালিকাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য (২%), এবং কৃষি ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম সংখ্যক বালিকা শ্রম দেয় (১.৭%)। শিশু শ্রমিকদের একটি বিরাট অংশ (৩১.৪%) জানিয়েছে যে, তাদের মহাজন গালাগালি করে থাকেন। শতকরা প্রায় পাঁচ জন শিশু জানিয়েছে তারা দৈহিকভাবে নিপীড়িত এবং শতকরা প্রায় ৯ জন জানিয়েছে তাদেরকে মানসিকভাবে নিপীড়ন করা হয। এ এলাকায় যেটা দেখা গেছে সেটা হল, মেয়েদের তুলনায় ছেলেরাই বেশি শোষিত হয়।

অধিকাংশ শিশুদেরকেই তাদের নিজের ঘরে কাজ করতে দেখা যায় তবে মাত্র শতকরা ৫ জন মেয়ে শ্রমিককে অন্যের বাড়ি গিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। একটি বিষয় এ গবেষণায় দেখা গেছে যে, অক্ষরজ্ঞানহীন মায়েদের বেশি সংখ্যক সন্তানদেরই শ্রম দিতে হয়। শিক্ষার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশু শ্রমিকের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। আরো দেখা গেছে, যাদের জমির পরিমাণ কম আছে তাদের শিশুরাই বেশি শ্রমিক। দেখা গেছে, শ্রমিকদের সন্তানরাও শ্রমিক হয় (৪৫.৮%); কিন্তু চাকরীজীবিদের সন্তানদের কম সংখ্যক শ্রমিক হয় (২৬.৭%)। যে সকল শিশুদের পিতামাতা বেচে নেই এমন শ্রমিকের সংখ্যা যাদের বাবা-মা বেচে আছে তাদের চেয়ে বেশি।

দেশের ভবিষ্যত এই শিশুদের শ্রমিক না বানিয়ে তাদের হাতে বই তুলে দিতে হবে। তাই বর্জন করতে হবে শিশু শ্রম। এজন্য চাই যথাযথ পদক্ষেপ।

সাক্ষরতার প্রসার ঃ মানিকগঞ্জে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব*

সমীর রঞ্জন নাথ, আবদুলাহেল হাদী ও আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

১৯৮৫ সালে মানিকগঞ্জে পরীক্ষামূলকভাবে মাত্র ২২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বা নন ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন (এনএফপিই) ৮-১০ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য তিন বছর মেয়াদী একটি কর্মসূচি। ব্র্যাক ১১-১৪ বছর বয়স্ক কিশোর কিশোরীদের জন্য অপর একটি শিক্ষা কর্মসূচি চালু করেছে। বর্তমানে তা বেসিক এডুকেশন ফর ওল্ডার চিলড্রেন (বিইওসি) নামে পরিচিত। এসকল স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেয়া হয় (৭০% মেয়ে) ।

১৯৯৪–এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্র্যাক ৫৫টি জেলার ৩০৩ টি থানায় ২৮,২৭৪টি স্কুল চালু করে এবং এর শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২৭,০৩১ জন। এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি চালু করার ফলে কর্ম এলাকায় ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার ও সাক্ষরতার হারে কোন প্রভাব পড়েছে কিনা তা জানা এবং এসকল হার বৃদ্ধিতে আর্থ-সামাজিক চলকের গুরুত্ব কতটুকু তা দেখা।

এজন্য মানিকগঞ্জ জেলার ৬৭টি গ্রামের ৭৪৯টি খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয। গ্রামগুলোর মধ্যে সমীক্ষাকালে ৩১টি গ্রামে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি চালু ছিল, ১৫টিতে পূর্বে চালু ছিল এবং ২১টিতে কখনো কর্মসূচি ছিল না। খানাগুলো থেকে মোট ১,৬৪৭ জন সদস্যের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়,

ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি চালু আছে এমন গ্রামে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি এবং যেখানে এ কর্মসূচি নেই সেখানে ছেলেদের শিক্ষার হার বেশি। দেখা গেছে, ব্র্যাক যেখানে শিক্ষা কর্মসূচি চালু করেছে, সেখানে ভূমিহীনের সংখ্যা বেশি এবং যেখানে এ কর্মসূচি নেই সেখানে ভূমহীনের সংখ্যা কম।

---

* Summary of the RED research report entitled "Impact of BRAC's education programme on enrolment and literacy in Manikgonj' by Samir R Nath, et al. 1995 August. 27p. (Summarized in Bangla by noor Jahan Akter Shetoo.

দেখা গেছে, ৬-১৬ বছর বয়স্ক যারা বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাদের এক তৃতীয়াংশ ব্র্যাক স্কুলে ও দুই তৃতীয়াংশ অন্যান্য স্কুলে। অন্যান্য স্কুলের চেয়ে ব্র্যাক স্কুলে মেয়ে বেশি ভর্তি হয়েছে। শিক্ষা কর্মসূচি চালু ছিল এমন সব গ্রামের শতকরা ১১ জন বর্তমানে ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আবার যে সমস্ত গ্রামে কর্মসূচি কখনও চালু ছিল না সেখানে শতকরা ১৫.৭ জন ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

৮-১০ বছর বয়স্ক ভর্তিকৃত ছেলে মেয়েদের প্রায় অর্ধেকই ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ৬-১০ বছরের মোট ভর্তিকৃত (৭৪.১%) ছেলে মেয়েদের শতকরা ১৬.৬ জন ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাকীরা (৫%) অন্যান্য স্কুলে। সুতরাং দেখা যায় এ এলাকার শিক্ষার হারে ব্র্যাকের অবদান অনেক।

১১-১৬ বছর বয়স্ক মোট ভর্তিকৃত ছেলে মেয়েদের (৯৭.৪%) মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ (২৭.২%) ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং বাকীরা অন্যান্য স্কুলে। লক্ষ্যণীয়, ব্র্যাক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের হার ছেলেদের চেয়ে বেশি।

স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ব্র্যাকের লক্ষীভূত গোষ্ঠী অন্যান্যদের চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। দেখা গেছে, লক্ষ্য বহির্ভূতদের চেয়ে লক্ষীভূত খানা থেকেই বেশি ছাত্র ছাত্রী স্কুলে আসে। মোট ভর্তিকৃত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ব্র্যাকের লক্ষ্য বহির্ভূত খানার ছেলে মেয়েদের চেয়ে লক্ষীভূত খানার ছেলে মেয়েই বেশি।

সাক্ষরতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ১০-২০ বছর বয়স্কদের প্রায় অর্ধেক (৫০.১%) সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। এর মধ্যে ১৯% ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য সফল হয়েছে যার বেশির ভাগই মেয়ে।

যেসব গ্রামে বর্তমানে ব্র্যাকের স্কুল চালু নেই সেখানেও সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোক রয়েছে। কারণ যখন ব্র্যাকের স্কুল চালু ছিল তখন এসব লোক সেখানে পড়াশুনা করেছে কিংবা পাশের গ্রামে ব্র্যাক স্কুলে পড়াশুনা করেছে। এতে দেখা গেছে, সে এলাকার মোট (৪৫.৬২%) সাক্ষরতার হারেও ব্র্যাকের অবদান

রয়েছে। আবার যে গ্রামগুলোতে ব্র্যাক কখনই স্কুল চালু করেনি সেখানকার সাক্ষরতার হার ব্র্যাকের কিছু অবদান রয়েছে (১০.৬%)।

ছেলে মেয়েদের শিক্ষার হার অনেকটা পিতামাতার শিক্ষার উপরও নির্ভর করে। ব্র্যাকের স্কুল চালু আছে কিন্তু পিতামাতা পড়াশুনা জানে না এসব এলাকার সাক্ষরতার হারে ব্র্যাকের অবদান রয়েছে (২৪.৯%)। অক্ষরজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের হার সব সময়ই বেশি যেহেতু ব্র্যাক বরাবরই ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

ব্র্যাকের লক্ষীভূত পরিবারের ছেলে মেয়েদের সাক্ষরজ্ঞানের হারে প্রায় পুরোটুকুই ব্র্যাকের অবদান (৮৫.৬%) এবং ব্র্যাক যেখানে কখনো শিক্ষা কর্মসূচি চালু করেনি কিংবা পূর্বে চালু ছিল এখন নেই সে সকল এলাকায়ও ব্র্যাকের অবদান অনেক (৬৫.৩%)। সর্বোপরি, ব্র্যাকের লক্ষীভূত পরিবারের শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে ব্র্যাক ৭৮.৪%কে সাক্ষরজ্ঞান দিয়েছে।

আলোচনা ও উপসংহার

দেখা গেছে, ব্র্যাকের লক্ষ্য বহির্ভূত গোষ্ঠীর চেয়ে লক্ষীভূত খানার ছেলে মেয়েরা ব্র্যাক স্কুলে বেশি ভর্তি হয়েছে। আবার বর্তমানে ব্র্যাক স্কুল চালু আছে এমন গ্রামের লক্ষীভূত খানার ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি ভর্তি হয়েছে। এটা সম্ভবত ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির নীতির কারণেই হয়েছে। যেসব গ্রামে সরকারি কিংবা বেসরকারি স্কুল নেই সে সকল গ্রামের ছেলে মেয়েদেরকে পাশের গ্রামের ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি হতে দেখা যায়। মোট কথা, ভর্তির হার কিংবা সাক্ষরতায় ব্র্যাকের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। যে সকল গ্রামে কোন স্কুল নেই ব্র্যাক সে সকল এলাকায়ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট।

উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের "আদর্শায়িত কৃতি অভীক্ষা*

এএইচ লতিফ, মোঃ নাজমুল হক, মীর জাহান আরা আরজু, শাহিন আক্তার ও মনিরা হাসান

ব্র্যাক ১৯৮৫ সাল থেকে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। মাত্র ২২টি স্কুল থেকে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ স্কুলের সংখ্যা ৩৪ হাজার। ব্র্যাক ৮-১০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য তিন বছর (এনএফপিই) ও কিশোর কিশোরীদের জন্য দুই বছর মেয়াদী (পিইওপি) এই দুই ধরনের শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ স্কুলগুলো গড়ে উঠার ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশু শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। এইসব স্কুলে শিশুরা তিন বছর ধরে লেখা পড়া করে। ব্র্যাক স্কুলে সাময়িক বা বাৎসরিক কোন পরীক্ষা নেই। একবার প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলে তিন বছর শেষে কোন পরীক্ষা ছাড়াই শিশুরা তৃতীয় শ্রেণী সমাপ্ত করে। শিক্ষার্থীরা ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকলে এবং যথাযথ মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই ধরে নেয়া হয় শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। যেহেতু কোন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই তাই তিন বছর শেষে এই শিক্ষার্থীরা ঠিক কতটুকু শিখেছে কিংবা অন্য স্কুলের তুলনায় কতটা ভাল বা খারাপ করছে তা জানার কোন সুনির্দিষ্ট উপায় নেই। তবে শিক্ষার অগ্রগতি মুল্যায়নের জন্য শিক্ষিকা সাপ্তাহিক কিছু পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। পরে এই ছাত্র ছাত্রীরা আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে থাকে। এ থেকে অবশ্য তাদের যোগ্যতা অর্জনের সফলতা কিছুটা আঁচ করা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এনএফপিই স্কুল থেকে তারা কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করছে তা জানার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞের সহযোগীতায় এনএফপিই মেয়াদোত্তীর্ণ শিশুদের অর্জিত জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য একটি আদর্শায়িত কৃতি অভীক্ষা বা Standardized Acheivement Test (SAT) তৈরির উদ্যোগ নেয়। এটা যেহেতু শুধুমাত্র এনএফপিই শিক্ষার্থীদের উপরই প্রয়োগ করা যাবে তাই পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় এনএফপিই কৃতি অভীক্ষা (NAT)।

---

* Summary of the RED Research report entitled "Development of standardized acheivement tests for BRAC NFPE schools" by AH Latif, et al. 1995. 57p. (Summarized in Bangla by Shaheen Akter)

অভীক্ষাটি ব্র্যাকের তৃতীয় বর্ষের বাংলা, সমাজ, গণিত ও ইংরেজী এই চারটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং এটা শুধুমাত্র এনএফপিই তৃতীয় বর্ষ সমাপনকারী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এই অভীক্ষায় ইংরেজীতে ২৫টি এবং বাকি তিনটি বিষয়ে ৩০টি করে এছাড়া দুটি অনুশীলন প্রশ্নসহ মোট ১১৭টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন রয়েছে। অভীক্ষাটি নেওয়ার সময় শিশুদের সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে পৃথক উত্তরপত্রে অথবা প্রশ্নপত্রে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে বলা হয় প্রতি বিষয়ে শিশুরা যতটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবে তত নম্বর পাবে। অতঃপর প্রতি বিষয়ের প্রাপ্ত মোট নম্বরকে চারটি যোগ্যতা পর্যায়ে (এ.বি.সি এবং ডি) প্রকাশ করা হয়। 'এ' হলো খুব ভালো, 'বি' ভাল, 'সি' মোটামুটি ভাল এবং 'ডি' হলো খারাপ এভাবে যোগ্যতাগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অভীক্ষাটি একটি নমুনা দলের উপর প্রয়োগ করে এনএফপিই শিক্ষার্থীদের ফলাফলের আদর্শমান নিরূপণ করা হয়। যাচাই করে দেখা গেছে, অভীক্ষাটি যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য।

যেহেতু অভীক্ষাটি আদর্শায়িত সেহেতু অনায়াসে এর দ্বারা যে কোন এনএফপিই স্কুলের চুড়ান্ত বর্ষ সমাপনকারী শিশুদের শ্রেণীতে অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করা যাবে। তবে, এই অভীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মৌখিক ও লেখার দক্ষতা সরাসরি পরিমাপ/যাচাই করা যাবে না। এছাড়া এনএফপিই কারিকুলাম পরিবর্তন হলে এই অভীক্ষাও পুনরায় সংশোধন করে ব্যবহার করতে হবে। অভীক্ষাটির গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। নতুবা এর যথার্থতা হারাবে। অবশ্যই দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা অভীক্ষাটি পরিচালনা করতে হবে।

ছেলে ও মেয়েদের স্কুলে ভর্তির অবস্থা ঃ প্রেক্ষিত গ্রাম বাংলা*

সমীর রঞ্জন নাথ

ব্যাপক নিরক্ষরতা ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি। আড়াই দশক আগে এদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও পল্লীর জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৯০ সালের হিসাবে দেখা গেছে সাক্ষরতার দিক থেকে ১৩১টি দেশের মধ্য বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭ তম । এ দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায ২৫ ভাগ মাত্র সাক্ষর (১৯৯১ জরিপ)।

বাংলাদেশে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার হার অত্যন্ত কম। আর যারা যায় তাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। বিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম বছরের মাথায় প্রায় এক চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। চতুর্থ শ্রেণীতে ওঠার আগেই শতকরা ৬০ ভাগ এবং পঞ্চম শ্রেণী শেষ হলে শতকরা ৮৮ ভাগ স্কুল ছেড়ে চলে যায়। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার পেছনে শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারটি কাজ করতে পারে। দেখা যায়, বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা মাত্র ২ ভাগ ব্যয় করা হয়।

দেখা গেছে, পল্লী ও শহর এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বরাদ্দের পরিমাণে বৈষম্য রয়েছে। আর মেয়েরাই এ বৈষম্যের প্রধান শিকার। পল্লী এলাকায় প্রায় শতকরা ৮৮ ভাগ মহিলাই নিরক্ষর। সরকার ও এনজিওগুলো পল্লী এলাকায় সাক্ষরতার হার বাড়ানো ও বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার হার হ্রাস করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় ছেলে মেয়ের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে কতটুকু বৈষম্য রয়েছে এবং এ বৈষম্যের কারণ চিহ্নিত করা এ গবেষণার উদ্দেশ্য।

---

* Summary of the RED research report entitled "Social factors underlying gender variation of school enrollment: case of rural Bangladesh" by SR Nath. 1995 July. 16p. (Summarized in Bangla by Quazi Faruque.)

এই গবেষণার লক্ষীভূত জনগোষ্ঠী ছিল মানিকগঞ্জের তিনটি ইউনিয়নের ৮৭টি গ্রামের ১১,৯৪৩টি খানার ৫৭,৪৮৯ জন। সেখানে ১৯৯১ সাল থেকে বছরে দু'বার ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সের শিশুদের স্কুলে অধ্যয়ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বর্তমান গবেষণার জন্য ৫,১৬৩ জনের একটি নমুনা দেয়া হয় দ্বৈবচয়নের ভিত্তিতে।

সমীক্ষাধীন ৬-১৬ বছর বয়সী শিশুদের মাত্র ৭২.৩% স্কুলে যায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের হার কম। দেখা গেছে, ৬ বছর বয়স্ক প্রায় অর্ধেক (৪৫%) ছেলে মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ভর্তির হার বয়সের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে এবং তা ১১ বছর বয়সে সর্বোচ্চ স্তরে (৮৮.৯%) পৌঁচেছে। এরপর আবার হ্রাস পেতে পেতে ১৬ বছর বয়স্কদের বেলায় এ হার ৫৩.৩% তে নেমেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরেই ছেলের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় বেশি দেখা গেছে।

ছেলে ও মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রে মায়েদের শিক্ষার একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যে সকল মায়েরা স্কুলে পড়ালেখা করেনি তাদের ছেলে ও মেয়েদের ভর্তির আনুপাতিক হারে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যে সকল মা ষষ্ঠ শ্রেণী কিংবা তার বেশি পড়ালেখা করেছে এমন পরিবারে দেখা গেছে, ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি প্রাধান্য পায়।

দেখা গেছে, শ্রমজীবি খানার ছেলে মেয়েদের তুলনায় অশ্রমজীবি খানার বেশি ছেলে মেয়ে স্কুলে যায়। আবার খানার জমির পরিমাণও ছেলে মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। খানার আবাসিক অবস্থাও বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। দেখা গেছে, ভাল আবাসিক সুবিধা সম্পন্ন খানার ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার অনেক বেশি। কম সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন খানার ছেলে মেয়েদের ভর্তির হার কম। এ ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের ভর্তি হারে অনেক পার্থক্য লক্ষণীয় কিন্তু ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস কোন প্রভাব ফেলেনা।

ছেলেদের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে খানার জমির মালিকানা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দেখা গেছে। পক্ষান্তারে, মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের মায়েদের শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পাওয়া গেছে।

দেখা গেছে, খানার জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে ছেলেদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরো দেখা যায়, যে খানার জমির পরিমাণ দুই একর তাদের ছেলেদের ভর্তির হার ভূমিহীন খানার ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি (১৩০%) কিন্তু মেয়েদের ভর্তির হার এক্ষেত্রে তার অর্ধেকেরও কম (৫০%)।

আবার যে সকল মেয়েদের মায়েরা কমপক্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাদে ভর্তির হার কোনদিন স্কুলে যায়নি এমন মায়েদের মেয়েদের ভর্তির হার প্রায় সাড়ে তিন বেশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ছেলেদের ভর্তির হার প্রায় দ্বিগুণ। স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেখা গেছে, ৬-১০ বছর বয়স্কদের চেয়ে ১১-১৬ বছর বয়স্ক ছেলে মেয়েদের ভর্তির হার অনেক বেশি (৪৯%)। এ হারে অবশ্য ছেলে ও মেয়েদের বেলায়ও পার্থক্য রয়েছে। আবাসিক সুযোগ সুবিধা ছেলে ও মেয়েদের উপর প্রায় সমান ভাবেই প্রভাব ফেলে। ভাল আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে এমন খানার ছেলে মেয়েদের ভর্তির হার আবাসিক সুবিধা ভাল নেই এমন খানার ছেলে মেয়েদের ভর্তির হারের চেয়ে বেশি।

বাংলাদেশে পল্লী এলাকায় ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার এখনো সন্তোষজনক নয়। দেখা যায় যে, মানিকগঞ্জ জেলার তিনটি ইউনিয়নে ৬-১৬ বছর বয়সী শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়নি কিংবা স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। স্কুলে শিশুদের ভর্তির হার বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও অবস্থার কাঙ্খিত উন্নতি হয়নি। এ ক্ষেত্রে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি মেয়েদের জন্য শতকরা ৭০ ভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।

ভর্তির প্রথম ছয় মাসের মধ্যে স্কুল ছেড়ে দেয়ার কারণঃ ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের উপর একটি সমীক্ষা*

মোঃ কায়সার আলী খান ও এএমআর চৌধুরী

পৃথিবীর যে সকল দেশে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের ১২ কোটি জনগোষ্ঠীর মাত্র ৩৩% অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার বয়স হায়েছে এমন ছেলে মেয়েদের শতকরা প্রায় ৩০-৪০ ভাগ স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত। আর যারা ভর্তি হয় তাদের শতকরা ৭০ ভাগ পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠার আগেই স্কুল ত্যাগ করে যাদের অধিকাংশই মেয়ে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা একটা সংকট। এ সংকটের গভীরতা উপলব্ধি করেই ব্র্যাক আশির দশকের মাঝামাঝি গ্রামীণ দরিদ্র শিশুদের জন্য যারা কখনো কোন স্কুলে যায়নি অথবা তৃতীয় শ্রেণীতে ওঠার আগেই স্কুল ত্যাগ করেছে তাদের জন্য একটি শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নেয়। ১৯৮৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ২২টি স্কুল নিয়ে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়। ৮-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৩ বছর মেয়াদী উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা আর ১৯৮৮ সাল থেকে ১১-১৬ বছর বয়সীদের জন্য ২বছর মেয়াদী কিশোর কিশোরীদের মৌলিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। (১৯৯২ থেকে ৩ বছর মেয়াদী করা হয়েছে) পল্লী এলাকায় এধরনের স্কুল চালু হওয়ার পর থেকে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৯৫ সালে ব্র্যাক স্কুলের সংখ্যা দাড়ায় ২৫ হাজারে এবং এ স্কুলগুলোতে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেয়া হয় (৭০% মেয়ে)।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এ কর্মসূচির উপযোগিতা ও কার্যকারীতা নির্ণয়ে ও এর উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। দেখা গেছে, এ কর্মসূচিতে

---

* Summary of the RED research report entitled "Why students dropout in the first six months of enrollment: a comprehensive study on the BRAC's education programme " by Md. Kaisar Ali Khan and AMR Chowdhury. 1995 April. 29p. (Summarized in Bangla by Khalid Hassan)

স্কুল ত্যাগীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং এই হার স্কুল শুরু হওয়ার প্রথম ছয় মাসেই বেশি। কেন এনএফপিই শিক্ষার্থীরা ভর্তির প্রথম ছয় মাসের মধ্যে স্কুল ছেড়ে দেয় তার কারণ চিহ্নিত করার জন্য সমীক্ষাটি হাতে নেয়া হয়। সমীক্ষার জন্য এনএফপিই কর্মসূচির পাঁচটি এলাকায় মোট ৪৮টি স্কুল থেকে ভর্তির প্রথম ছয় মাসের মধ্যে যারা স্কুল ছেড়ে যায়, যারা তাদের শূণ্যস্থান পূরণ করে এবং যারা সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করে এই তিন শ্রেণীর ১৫০ জন করে মোট ৪৫০ জন শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত স্কুলের ৪২ জন শিক্ষকেরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয।

সমীক্ষায় দেখা যায়, এনএফপিই শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের অধিকাংশই ছিল ভূমিহীন কৃষিজীবি। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ৬৪.৭% এসেছিল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত এবং দরিদ্র পরিবার থেকে আর এসব শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ তিন বছর মেয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত করেছিল। অন্যদিকে দেখা যায়, এনএফপিই স্কুল ত্যাগী ৫৭.৫% ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক ছিল শিক্ষিত। এর কারণ হিসাবে দেখা গেছে, শিক্ষিত অভিভাবকগণ উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল অপেক্ষা সরকারী প্রাথমিক স্কুলকে প্রাধান্য দেন। তারা বলেন, ব্র্যাক কোন সার্টিফিকেট দেয় না। এবং আরবী পড়ানো হয় না। অথচ পরবর্তীতে সাধারণ স্কুলে ভর্তি হতে হলে এগুলোর প্রয়োজন হয়। এ সমীক্ষায় দেখা যায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সাফল্যই বেশি। মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগই সফলভাবে তিন বছর মেয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এবং স্কুলে তাদের উপস্থিতির হারও ছিল ছেলেদের তুলনায় বেশি। এ কারণে অভিভাবকরা মেয়েদের শিক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক স্কুলের চাইতে এনএফপিই স্কুলেই বেশি প্রাধান্য দেন।

স্কুল ত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, ভর্তির প্রথম তিন মাসের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষার্থীর ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়া অথবা বয়স কম কিংবা বেশি হওয়ার কারণে তাদেরকে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় খোঁজ না নিয়েই এমন কিছু ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছিল যারা ব্র্যাক স্কুলে ভর্তির প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেনা এবং পরবর্তীতে এদের অনেকেই স্বেচ্ছায় স্কুল ছেড়ে চলে যায়। আবার এ ধরনের ছাত্র ছাত্রীদের কিছু সংখ্যক আগেই অন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। যে কারণেই হোক এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে যাওয়া ও স্কুলে ছেড়ে দেয়ার আর একটি বড় কারণ বাল্যবিবাহের কারণেও বেশ কিছু মেয়েকে (৪.৫%) স্কুল ছেড়ে দিতে হয়েছে। কতিপয় অভিভাবক

জানান, তারা ব্র্যাক সম্পর্কে ভূল ধারণার কারণে আবার কেহ সংসারের আয় বাড়ানোর কাজে তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়োজিত করার জন্য আর বেশ কিছু অভিভাবক ধর্মীয় কারণে তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুল থেকে নিয়ে গেছেন। ফলাফল ভালো না হওয়ার কারণেও বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রী স্বেচ্ছায় স্কুল ছেড়ে দিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ছাত্র ছাত্রীদের এনএফপিই স্কুল ছেড়ে যাওয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করে সুষ্ঠু শিক্ষার্থী জরিপ এবং ভর্তির জন্য প্রাথমিক নির্বাচনের সময় নির্ধারিত মাপকাঠি অনুসরণের উপর। ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য মাঠ পর্যায়ের এনএফপিই কর্মী ও পল্লীর জনসাধরণের মধ্যে ব্যাপক যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজন যা পল্লীর সর্বসাধারণকে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে।

স্কুল খোলার জন্য শিক্ষার্থী জরিপের সময় দক্ষ পাঠ কর্মীদের দায়িত্ব দেয়া উচিত যাতে জরিপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে ছাত্র ছাত্রী নির্বাচনের সময় তা কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। শিক্ষার্থী জরিপের আগে ব্র্যাক কর্মীদেরকে সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের সংগে ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং স্কুল চালুর পর তা আরও জোরদার করতে হবে। ব্র্যাক কর্মীদেরকে স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক এবং এর ফলে অনেক অনাকাংক্ষিত সমস্যা সমাধান সহজ হবে। কর্মসূচি সংগঠকরা এনএফপিই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান করবেন এবং সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ছাত্র ছাত্রীর বহিস্কার করা নিষিদ্ধ করতে হবে। ঘন ঘন কর্মী বদলীর প্রবণতা কমিয়ে আনা যেতে পারে এবং বদলীর সময় সংশিষ্ট কর্মীকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে যাতে তিনি নবাগত কর্মীকে কর্মসূচির সুবিধাভোগী ও সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য পাঠক্রমের শুরু থেকেই কর্মসূচির জন্য প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মী ঃ ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা*

আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী, সাদিয়া এ চৌধুরী, মোঃ নজরুল ইসলাম, আকরামুল ইসলাম এবং প্যাট্রিক ভোন

যক্ষ্মা রোগ বিশ্বের প্রায় সকল দেশে গুরুতর হুমকি হিসেবে বিরাজ করছে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে এ রোগ কখনোই বিদায় নেয়নি, যদিও অত্যন্ত কার্যকর চিকিৎসা ব্যবস্থা নাগালের মধ্যেই ছিল। এসব দেশে দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণ খুব বেশি। বছরে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক এ রোগের শিকার এবং ২০-৩০ লক্ষ লোক এ রোগে মারা যায়।

ব্র্যাক ১৯৮৪ সালে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে একটি থানায় সর্ব প্রথম যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু করে। এতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়। ব্র্যাক ১৯৯২ সালে আরও ১০টি থানায় এই কর্মসূচি চালু করে। ১৯৯৫ সালে এ কর্মসূচির আরো সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৯৬ সাল নাগাদ এ কর্মসূচির অধীনে মোট ১৮টি থানাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

যক্ষ্মা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে না পারা এবং তাদের চিকিৎসাধীন রাখতে না পারা যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে এক প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের মতো অনেক দেশেই এ রোগ সম্পর্কে সমাজ জীবনে আতঙ্ক রয়েছে, সেই সঙ্গে নানা কুসংস্কারও রয়েছে। ফলে রোগীরা চিকিৎসা নিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে সহজে যেতে চায় না। এ রোগের জন্য চিকিৎসা চলে ছ'মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত , ফলে অনেক রোগী ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে এবং নিয়ম মেনে চলে না।

যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা শহরাঞ্চলেই বেশি। মহিলাদের দ্বিগুণ সংখ্যক পুরুষ এ রোগে আক্রান্ত বলে জরিপে জানা গেছে। ১৯৮৭-৮৮ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ১৫ বছর ও তার চেয়ে

* Summary of the RED research report entitled "Community health workers can control tuberculosis: the BRAC experience in Bangladesh" by Ahmad Mushtaque Raza Chowdhury, et. al. 1995. 20p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah) This paper was also published in the Lancet [Chowdhury AMR, et al. Control of tubrculosis by community health worker in Bangladesh. Lancet 1997;350:169-72]

বেশি বয়সী জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১ জনের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী কফ-কাশির ব্যাধি রয়েছে। ১৯৮৪ সালে একটি থানায় ৫০টি গ্রামে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৫ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সী জনসংখ্যার শতকরা ০.৩৩-০.৫৫ জনের মধ্যে Acid fast bacilli আছে অর্থাৎ AFB Positive।

যক্ষ্মা প্রতিরোধে ব্র্যাকের কর্মসূচি

ব্র্যাক প্রথম পর্যায়ে (১৯৮৪-৯১) একটি থানায় ২,২০,০০০ জনের উপর কর্মসূচি পরিচালনা করা হয় এবং দেখা গেছে, দুই তৃতীয়াংশ রোগী ১২ মাসের চিকিৎসার পুরোটাই গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৯২-৯৪) আরো ৯টি থানায় কর্মসূচি পরিচালিত হয়। দু'মাসের কোর্সে ৩০টি স্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেকশন একদিন অন্তর একটি , আইএনএইচ ও থায়াসেটাজেন প্রতিদিন একটি করে ১২ মাসের এই চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসা শুরুর পর থেকে কফ-কাশিতে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের কফ আবার ১, ৩, ৬, ৯, ১২ ও ১৩ তম মাসে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় যাদের মধ্যে যক্ষ্মার জীবানু পাওয়া যায় তাদেরকে নির্দিষ্ট ক্লিনিক বা হাসপাতালে পাঠানো হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৯৫ সালে শুরু হয় এবং আরো ৮টি থনা এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহী রোগীদেরকে ২০০ টাকা জমা রাখতে বলা হয় এবং একটি চুক্তিপত্রে সই করতে বলা হয়। চিকিৎসা পুরোপুরি ও সুচারুভাবে সমাপ্ত করলে ঐ টাকা থেকে রোগীদেরকে ১০০ টাকা ফেরত দেয়া হয় এবং বাকী ১০০ টাকা স্বাস্থ্য কর্মীদেরকে উৎসাহ ভাতা হিসাবে দেয়া হয়। রোগীর যদি টাকা জমা দেয়ার সংগতি না থাকে তবে ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠন তার পক্ষ থেকে এ টাকা রোধ করে এবং স্বাস্থ্য কর্মীরাও ২৫ টাকা উৎসাহ ভাতা পান। দেখা যায়, ব্র্যাক কর্মসূচির ফলে যক্ষ্মা রোগীদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়। তবে রোগীরা সংখ্যায় অল্পও রোগের পুনরাক্রমণ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রমাণের জন্য তা যথেষ্ট। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মী ও ব্র্যাকের কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মীরা অধিকাংশ রোগীদের সনাক্ত করেছেন (৬৯%)।

দেখা গেছে, ১৯৯২-৯৪ সালে সনাক্তকৃত মোট ৩,৮৮৬ জন রোগীর মধ্যে ৯০% ব্র্যাকের চিকিৎসা গ্রহণ করেছে এবং তাদের ৮১% চিকিৎসার ১২ মাসের মাত্রা পূর্ণ করেছেন। শতকরা ৮৫ জনই চিকিৎসার প্রথম তিন মাসে সেরে উঠেছেন এবং ১০% লোক এ রোগে মারা যায়। নগন্য সংখ্যক রোগী এ ব্যবস্থায় সেরে ওঠেনি (১.৫%) ১৯৯৫ সালে মোট ১,৭৪১ জন যক্ষ্মা রোগী সনাক্ত করা হয় যাদের সকলেই চিকিৎসার জন্য ৮ মাসের ব্যবস্থা নিয়েছেন। রোগীদের তিন চতুর্থাংশই পুরুষ এবং সকলের বয়স ৩৫-৪৫ এর মধ্যে। নতুন রোগীদের ৮৫% এবং যারা পূবেও চিকিৎসা নিয়েছেন তাদের ৯০% আট মাসের ব্যবস্থায় সেড়ে উঠেছেন তবে ৮% রোগী মারা যায় এবং ২% রোগী রোগমুক্ত হতে পারে নি।

ব্র্যাক কর্মসূচিভূক্ত দু'টি এলাকা ও একটি কম্পারিজন এলাকায় মোট ৪৪,৫০৫ জনের উপর জরিপ চালানো হয়। এদের মধ্যে ৭৯৫ জন দীর্ঘ দিন ধরে কফ-কাশিতে ভুগছেন এবং এদের অর্ধেকই কম্পরিজন এলাকার। এদের আবার দুই তৃতীয়াংশই পুরুষ। রোগীদের তিন চতুর্থাংশ পুরুষ। একজন বাদে সকলের বয়স ৩৫ বছরের বেশি। এক তৃতীয়াংশ নিরক্ষর এবং মোট রোগীর প্রায় অর্ধেকই দরিদ্র। দেখা যায়, ব্র্যাক কর্মসূচিভূক্ত দুটি এলাকায় যথাক্রমে ২.৭% ও ২.৫% এবং কম্পারিজন এলাকায় ৩.৪% এর মধ্যে AFB positive পাওয়া যায়।

যক্ষ্মা রোগীদের ব্যাপারে গ্রামবাসী ও পরিবারের সদস্যদের প্রায় অর্ধেকই তেমন কোন বিরূপ মানসিকতা পোষণ করেন না। রোগীরা জানিয়েছেন , রোগের খবর জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর পরিবারে তারা বিছিন্ন হয়ে পড়েন। বেশ কয়েকজন রোগী বলেছেন, এক শ্রেণীর গ্রামবাসী তাদেরকে চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

সরকারের স্বাস্থ্য সুবিধার সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি তেমন সাফল্য পায়নি। এদিক থেকে ব্র্যাকের কর্মসূচি হয়েছে যথাবিহিত। এই কর্মসূচি সমস্যাটিকে মোকাবেলা করেছে সার্থকতার সঙ্গে। এ কাজে ব্র্যাক এগিয়েছে যথাযথ পদ্ধতি অনুযায়ী। স্বাস্থ্য কর্মীরা কফ সংগ্রহ করেছে, তারা উৎসাহ ভাতা পেয়েছে এবং দরিদ্র রোগীরাও জামানতের টাকা দিয়েছে, একটি চুক্তিতে সই করেছে যে তারা চিকিৎসার মেয়াদ সমাপ্ত করবে।

দেখা গেছে, এ রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে ব্র্যাকের কর্মসূচি অত্যন্ত কার্যকরী। ব্র্যাক সহজেই গ্রামবাসীদের আস্থা অর্জন করেছে। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও জামানতের অর্থ দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। কফ্‌ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাফল্যের হার নিঃসন্দেহে গর্ব করার মতো। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, রোগী সনাক্তকরণের সংখ্যা বৃদ্ধি, পুনরাক্রমণ হ্রাস এবং রোগমুক্তির বর্ধিত হার বজায় রাখা– এগুলো এখন হবে ব্র্যাকের জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জ।

স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ধরন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের সমাজ*

সৈয়দ মাসুদ আহমদ

বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে। রোগীরা বিভিন্ন সময়ে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির শরণাপন্ন হয়। কোন রোগের জন্য তারা কোন চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করবে তা বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। এ আলোচনার মূল বিষয় হল কেন অসুস্থতার সময় কোন একটি বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি রোগীরা বেশি আস্থা প্রদর্শন করে।

আলোচানা শুরুতেই দুটি বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার করে নেয় প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে 'রোগ' ও 'অসুস্থতা'। রোগ বলতে শরীর বা শরীরের বিশেষ কোন একটি অংগ বা তন্ত্রের গঠন বা কর্মে কোন ঘাটতিকে বোঝায়। অসুস্থতা বলতে রোগের ফলে কোন ব্যক্তি যে সব শারিরীক ও মানসিক অসুবিধা অনুভব করেন তাকে বোঝায়। অসুস্থতার অবস্থানটি রোগীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক গঠন এবং আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী নির্ণীত হয়। এক একটি সমাজ অসুস্থতাকে উপসর্গ অনুযায়ী একেক ভাবে সনাক্ত করে। তাই সমাজ এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী রোগ নির্ণয়, রোগের কারণ, তার প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা, এসব কিছুর ব্যাখ্যা একেক রকম হয়ে থাকে।

রোগী বা তার আত্মীয়স্বজন অসুস্থতার সময় আস্থা আছে এমন চিকিৎসা পদ্ধতির দারস্থ হয়। যে কোন চিকিৎসা ব্যবস্থার কতগুলি ধাপ থাকে। যেমন– লোকজ এক ধাপ যা পরিবার ও সামাজিকভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে উঠে ।

এ ধাপেই প্রথম রোগ সনাক্ত হয় এবং কোন এক ধরনের চিকিৎসা শুরু হয়। দ্বিতীয় ধাপে আছে সেই ধরনের মানুষ যারা যথাযথভাবে শিক্ষিত না হয়েও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে চিকিৎসা চালিয়ে যান,

* Summary of the RED research report entitled "Health seeking behaviour: influencing factors in a medically pluralistic society" by Syed Masud Ahmed. 1995. 6p. (Summarized in Bangla by Gazi Masum Ahmad)

যেমন দাই, সাপুড়ে ও ঝাড়ফুক করার ফকীর ও ধর্মীও নেতা ইত্যাদি। এই দুই ধাপ নিয়েই তৈরি হয় ঐতিহ্যগত দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি। সর্বোচ্চ ধাপে থাকে চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিক পেশাদার শ্রেণী। বলা যায়, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগের চিকিৎসা করে, অসুস্থতার নয়। অন্যদিকে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি 'অসুস্থতার' চিকিৎসা করে রোগের নয়।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, দেশীয় পদ্ধতিতে প্রাথমিকভাবে তিন ধরনের অসুস্থতার চিকিৎসা দেয় হয়। হঠাৎ রোগ হয়ে নিজে নিজে সেরে যায় এমন সব রোগ, জীবনের জন্য তাৎক্ষনিক হুমকি নয় এমন সব দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা এবং মানসিক সমস্যাজনিত শারিরীক উপসর্গ। এসবগুলোর ক্ষেত্রে রোগতত্ত্বগত চিকিৎসার গুরুত্ব সামান্যই। দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি এ সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী। এসব রোগের ক্ষেত্রে এধরনের চিকিৎসা দ্বারা সহজেই রোগীর আস্থা অর্জন করা সম্ভব। আবার একই সময়ে আধুনিক ও দেশজ উভয় পদ্ধতির চিকিৎসা গ্রহণ করে আধুনিক চিকিৎসায় ভালো হয়েও দেশজ পদ্ধতির প্রতি আস্থা অর্জিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষাকেই চিকিৎসা বলে মনে করা হয় এবং আধুনিক চিকিৎসাকে ব্যর্থ বলে দোষারোপ করা হয়। আধুনিক চিকিৎসায় সাধারণতঃ পরিবার বা সমাজের সকলকে সম্পৃক্ত না করার কারণে দেশজ পদ্ধতি এক্ষেত্রে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পায়। দেশজ পদ্ধতি এসকল ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনের সহানুভূতি, সেবা ও নৈকট্যকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সহজবোধ্য ভাষায় রোগের ব্যাখ্যা দিয়ে রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনের আস্থা অর্জন করে।

রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবে কি না তার জন্য রোগ কতটা গুরুতর তার চাইতে ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য কারণগুলো বেশি গুরুত্ব পায়। যেমন ব্যক্তিগত অসুবিধা, সামাজিক সম্পর্ক, রোগীর প্রতি অন্যান্যদের মনযোগ এবং অসুস্থতার স্বীকৃতি বা এমন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মতামতের জন্য অপেক্ষা করা যিনি রোগীকে 'অসুস্থ' বলার পরই কেবল চিকিৎসা শুরু হতে পারে। অনেক সময় রোগী নিজেই সময়সীমা নির্ধারণ করেন যেমন, তিন দিনের মধ্যে ভালো না হলে তবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হব' ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যায় রোগের তীব্রতা অপেক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলো চিকিৎসা পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও কোন পদ্ধতির চিকিৎসা ব্যবস্থা কতটা ব্যায়বহুল তার

উপরেও পছন্দ অপছন্দ নির্ভরশীল। দেখা গেছে, উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষ কোন রোগ আধুনিক চিকিৎসায় এবং কোন রোগ দেশীয় চিকিৎসায় সারবে তা শ্রেণীবিন্যাস করে নেয় এবং সাধারণত: মারাত্মক সব অসুখের ক্ষেত্রে আধুনিক এবং ক্রমশ: কর্মক্ষমতা হ্রাস করে এমন সব দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার ক্ষেত্রে দেশীয় পদ্ধতির চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেয়।

দেশজ পদ্ধতির চিকিৎসা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে রোগীর শারিরীক, আর্থিক বা শিক্ষাগত অবস্থার সাথে কোন যোগসূত্র খুজে পাওয়া যায় না। দেখা গেছে, আগে উপকার হয়েছে এমন পদ্ধতির চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দূরত্ব, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগ এমনকি সেবা কর্মীদের দুর্ব্যবহারও বাধা হয়ে দাড়ায় না। যে সকল ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা তার সাফল্য প্রমাণ করতে পেরেছে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনগণ তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। তবে রোগ সম্পর্কে তাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণা থেকেই যায়। এবং এটাও সত্যি যে, প্রচলিত ধ্যান ধারণা এসকল ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে অন্তরায় হয়ে দাড়ায় না।

সাধারণ মানুষ কোন ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করবে তা ঐ বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতিটি তাদের কাছে কিভাবে তুলে ধরা হবে তার উপরেও নির্ভর করে। আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে উন্নত মনমানসিকতার এবং সামাজিক গতিশীলতার পরিচায়ক। তবে জাতীয় বা ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করা হলে দেশজ পদ্ধতিকে ঐতিহ্যবাহী হিসাবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যেমন আজকের চীন এবং ভারত সরকারি এবং রাজনৈতিকভাবে তাদের দেশজ চিকিৎসা ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করে দেশজ সংস্কৃতির মূল্যায়ন করছে।

চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রদানের ব্যবহারিক দিক ও তার ব্যবহার্য উপাদানসমূহও ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসা পদ্ধতি নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ধরন দেশজ পদ্ধতি আলাদা। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসায় তার আত্মীয়স্বজন বা অন্যান্যদের কোন ভূমিকা থাকে না। বা থাকলেও খুবই অল্প। অন্যদিকে দেশজ পদ্ধতিতে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তবে আধুনিক চিকিৎসায় চিকিৎসক ক্ষতিকর নয় এমন প্রচলিত ধ্যান ধারণায় আঘাত না করেও আধুনিক চিকিৎসার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারেন। অনেক সময় আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগী এবং চিকিৎসকের

মধ্যবর্তী সামাজিক দূরত্ব প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়াতে পারে। রোগী এবং চিকিৎসকের পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহযোগীতা দুরত্ব কমিয়ে চিকিৎসায় সাফল্য নিয়ে আসতে পারে। তবে কোন কোন সময় এ সামাজিক দূরত্ব চিকিৎসকের উপর আস্থা বাড়ায়।

আপাতদৃষ্টিতে, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের প্রয়োজনে মানুষ কোন ধরনের আচরণ করবে তা বোঝা সহজ কোন বিষয় নয় এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির সাফল্যের জন্য মানুষের এই বিচিত্র আচার আচরণকে বুঝতে হবে। তাহলেই পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবার পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

পাঁচ বছরের কম বয়সী গ্রামীণ শিশুদের শারিরিক বৃদ্ধির উপর একটি সমীক্ষা*

করিমূল হক ও শোয়েব আহমেদ

সুস্থতা ও কর্মক্ষমতার জন্য পুষ্টি একটি মৌলিক চাহিদা। বহু দরিদ্র দেশ তাদের জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় পুষ্টির যোগান দিতে পারে না। বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। অপুষ্টির শিকার প্রধানত: মহিলা এবং শিশুরাই। পুষ্টির অভাবে শিশুরা সহজে রোগাক্রান্ত হয় এবং তাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না এবং তারা দুর্বল ও খর্বকায় হয়ে থাকে। তবে খাদ্যাভাবই অপুষ্টির একমাত্র কারণ নয়। শিশুদের পুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত খাবারের পাশাপাশি সঠিক সেবাযত্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের গুরুত্ব ও অপরিসীম। প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় চল্লিশ লক্ষ শিশু অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে।

বাংলাদেশের গ্রামে দরিদ্র মা ও শিশুদের পুষ্টির উন্নতির লক্ষে ব্র্যাক বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত জামালপুর ও যশোর জেলার ৮টি গ্রামের পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের উপর ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি সমীক্ষা চালায়। এ সমীক্ষায় শিশুর ওজন, উচ্চতা, বাহুর পরিধি ও বয়স সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১৯৯১ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে শিশু ও তার পরিবার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলীও সংগ্রহ করা হয়।

দেখা যায় যে, সমীক্ষাধীন গ্রামগুলোতে পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের জন্য অপুষ্টি একটি মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুদের মাত্র শতকরা ৪ টি শিশু সঠিক পুষ্টির যোগান পায় এবং কাংঙ্খিত ওজন অর্জন করে। অবশিষ্টাংশ কোন না কোন মাত্রায় অপুষ্টির শিকার। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, শিশুদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে অপুষ্টিতে আক্রান্ত হবার হার বাড়তে থাকে। মায়ের শিক্ষার সাথেও অপুষ্টির সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। শিক্ষিত মায়েদের শিশুদের অপুষ্টির হার কম এবং অশিক্ষিত মায়েদের

---

* Summary of the RED research report entitled “Growth and development of under-five children in rural Bangladesh: results from anthropometric measurement of 617 cases” by Karimul Hoque and Shoaid Ahmed. 1995 April. 19p. (Summarized in Bangla by Gazi Masum Ahmad)

শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টির হার বেশি দেখা যায়। পরিবারের আয়ের সাথেও অপুষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। বেশি আয়ের পরিবারের শিশুরা তুলনামূলকভাবে অপুষ্টিতে কম ভোগে এবং স্বল্প আয়ের পরিবারের শিশুরা বেশি হারে অপুষ্টির শিকার হয়। শিশুদের মধ্যে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় অপুষ্টিতে কম ভোগে। অনুন্নত দেশসমূহে শিশুরাই অপুষ্টির প্রথম শিকার। এজন্য অপর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ, ক্রয় ক্ষমতার অভাব, দুর্বল স্বাস্থ্য, অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা দায়ী। এগুলো বাংলাদেশে সার্বিক জাতীয় উন্নয়নেও বাধাস্বরূপ বটে।

গবেষণায় গ্রামীণ শিশুদের পুষ্টিহীনতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা উদ্বেগের কারণ এবং এখনই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এ পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকারে রূপ নেবে। ১৯৭৫-৭৬ সালে শতকরা ৭৫ জন অপুষ্টিতে ভূগছিল। ১৯৮১-৮২ সালে তা বেড়ে দাড়িয়েছে শতকরা ৮৫ জনে। স্পষ্ট বলা যায়, শিশুদের পুষ্টির সার্বিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

শাক-সবজী ও হাঁস-মুরগী পুষ্টির সহজলভ্য উৎস। এগুলো বাড়িতে এবং বাড়ির আশেপাশে উৎপাদন করা সম্ভব। গ্রামের লোকজনের মধ্যে বাড়ি-ঘরের আশে পাশে শাক-সবজী উৎপাদনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে শিশুদের পুষ্টির যোগান দেয়া সহজ হয়। ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত গ্রামে মায়েদের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুর পুষ্টি ও বুদ্ধি বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক। যেমন, উপযুক্ত সময়ে শিশুকে প্রয়োজনীয় বর্ধিত খাবার দেয়া, নবজাত শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো এবং ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে পরিবারের সকলের জন্য খাদ্যের সুষম বন্টন ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা একান্ত প্রয়োজন। গরীব ও স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোকে উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে যাতে তাদেরও অপরিহার্য পুষ্টির যোগান দেয়া যায়।

মায়েদের টিকাদন সম্পর্কিত জ্ঞান গ্রামীণ এলাকায় শিশুদের টিকাদানের ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখে ?*

আবদুলাহেল হাদী ও সমীর রঞ্জন নাথ

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বা এক্সপানডেড প্রোগ্রাম অন ইম্যুনাইজেশন (ইপিআই) ১৯৮৫ সালে শুরু হয়। অল্প সময়ে এ কর্মসূচি অনেক পরিচিতি লাভ করেছে। তার অন্যতম কারণ , এ কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সরকারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামীন এলাকায় টিকাদান কর্মসূচির আওতায় কত শিশুকে আনা সম্ভব হয়েছে এবং শিশুদের টিকা দান সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মায়েদের জ্ঞান কোন ভূমিকা রাখে কিনা তা দেখার জন্য এ সমীক্ষা চালানো হয়। বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বিশেষ করে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি) এ সম্পর্কে মায়েদের জ্ঞান দিতে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে তা দেখাও এ সমীক্ষার আওতাভূক্ত ছিল।

‘ওয়াচ (Watch)’ নামে ব্র্যাকের একটি নিরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে যা বাংলাদেশের ১০টি জেলার ৭০টি গ্রামে কাজ করছে। ওয়াচ কর্মসূচিভূক্ত প্রতিটি গ্রামের দুই বছরের কম বয়স্ক সকল শিশুদের এই সমীক্ষার আওতায় আনা হয়। এ বয়সের মোট শিশুর সংখ্যা ছিল ২,৩২৭। এসব এলাকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ খানাই ব্র্যাকের আরডিপি কিংবা অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার আয় উপার্জনমূলক যে কোন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। বাকীগুলো কোন সংস্থার সাথে জড়িত নয়।

ফলাফলে দেখা গেছে, ১২-২৩ মাসের শতকরা ৭৯টি শিশুকেই টিকার সম্পূর্ণ মাত্রা দেয়া হয়েছে। এ হার কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার চেয়ে কর্মসূচি এলাকায় অনেক বেশি। জামালপুর ও কুষ্টিয়ায় শিশুদের শতকরা ৯০ জনকেই সম্পূর্ণ টিকা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কক্সবাজার, মৌলভীবাজার ও লালমনিরহাটে টিকা দানের হার অত্যন্ত কম। তবে কিশোরগঞ্জের হাওড় এলাকায় এ হার আরো কম।

---

* Summary of the RED research report entitled “Immunization coverage in rural Bangladesh: do mother’s knowledge play any role?” by Abdullahel Hadi and SR Nath. 1995 December. 4p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

দেখা গেছে, অধিকাংশ মায়েদের (৫৫.৪%) বিসিজি টিকা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে। কিছু সংখ্যক ৩৫.৪% মা জানেন বিসিজি টিকা যক্ষ্মা প্রতিরোধ করে। পোলিও টিকা সম্পর্কে দেশ জুড়ে প্রচার অভিযান চালানোর পর তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে, এই প্রচার অভিযান গ্রামীণ এলাকায় খুব কমই প্রভাব ফেলতে পেরেছে। যেমন দেখা যায় শতকরা মাত্র ৮-১২ জন মা টিকা দানের সম্পূর্ণ মাত্র ও টিকা কি কি রোগ প্রতিরোধ করে এ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পেরেছেন।

দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, রেডিও, টেলিভিশন এবং দেশ জুড়ে বিভিন্ন পোষ্টারের মাধ্যমে প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার তৃনমূল পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে মানুষের দুয়ারে গিয়ে টিকাদানের উপকারিতা সম্পর্কে মায়েদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। এর পরেও দেখা গেছে, মায়েরা এ সম্পর্কে খুব কমই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু যখন ব্র্যাক সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, শিশুদের টিকা কেন দেয়া উচিত, দেখা গেছে অধিকাংশ সদস্যই (৫৬.৭%) সঠিক জবাব দিতে পেরেছেন।

বিসিজি টিকা কোন্ কোন্ রোগ প্রতিরোধ করে এ সম্পর্কে জ্ঞান এবং টিকা দানের সঠিক মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞানের পার্থক্য মূলত: কর্মসূচিভূক্ত হওয়া বা না হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। যে সকল এলাকায় ব্র্যাক কিংবা অন্য কোন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মসূচি রয়েছে এবং মায়েরা এ কর্মসূচিভূক্ত হয়েছেন তারা কর্মসূচি বহির্ভূত মায়েদের চেয়ে টিকা দান সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। প্রায় তিন চতুর্থাংশ মা জানেন যে, টিকাদান কেন্দ্রে গিয়ে তাদের শিশুদের টিকা দেয়া সম্ভব। দেখা গেছে, গ্রামীণ দরিদ্র অনেক মহিলার কাছে টিকাদান কেন্দ্র পরিচিত।

বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা প্রায় এক দশক ধরে সম্প্রসারিত টিকাদন কর্মসূচি (ইপিআই) সম্পর্কে বিভিন্নভাবেপ্রচার অভিযান চালালেও খুব কম সংখ্যক মাকেই এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা সম্ভব হয়েছে। তবে গ্রামীণ এলাকায় টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে কম সংখ্যক জনগণই ওয়াকিবহাল। তাই এজন্য প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি হাতে নেয়া।

পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইজিভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব*

এসএম জিয়াউদ্দিন হায়দার, সাবাহ্ তারান্নুম ও ফরিদ আহমেদ

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম ও সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে মা ও শিশুরা পরিমিত খাদ্যের অভাবে প্রতিনিয়ত অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। এছাড়া ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট খাদ্য সংকট পুষ্টিমানের মারাত্মক অবনতি ঘটায়। দেশে মাত্র ৪৫% জনগণ স্বাস্থ্য সুবিধা পাচ্ছে। পাঁচ বৎসরের নীচের শিশুদের এক তৃতীয়াংশের মৃত্যু কোন না কোনভাবে অপুষ্টিজনিত কারণে হয়ে থাকে। বাংলাদেশে শতকরা ৬৯% ভাগ শিশু কমবেশি অপুষ্টির শিকার। এ জন্য দারিদ্র্যই প্রধানত দায়ী।

গ্রামের দুঃস্থ মহিলাদের উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ব্র্যাক ১৯৮৭ সালে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলাদের উন্নয়ন বা Income generation for vulnerable group development programme (IGVGDP) বা আইজিভিজিডি কর্মসূচি চালু করেছে। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে ব্র্যাক এ কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

এ কর্মসূচির অধীনে ভিজিডি কার্ডধারী মহিলাদের প্রত্যেককে দুই বৎসর মেয়াদে প্রতি মাসে ৩১.২৫ কেজি গম দেয়া হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের মুরগীর চিকিৎসা, ঋণ স্কীম এবং মুরগী পালন ও বিপনন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া মাঠকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়েও এসব বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করেন।

---

* Summary of 3 RED research reports of 1995: Nutritional impact study of the IGVGD programme: report of January 1995 by SM Ziauddin Hyder; 2. Nutritional impact study of the IGVGD programme: report of July 1995 by SM Ziauddin Hyder; 3. Perception of the IGVGD programme participants on the effects of the programme on socioeconomic and nutritional well being by Sabah Tarannum, Farid Ahmed and SMZ Hyder. (Summarized in Bangla by ZAM Wahidul Hoque)

আইজিভিজিডি কর্মসূচি মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে কতখানি প্রভাব রাখছে তা যাচাই করার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ টাঙ্গাইল সদর ও কালিহাতি থানার কর্মসূচি এলাকায় সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় উপাত্ত নেয়া হয় উক্ত দুই থানায় আইজিভিজিডি সদস্য পরিবার এবং কর্মসূচি এলাকার ভেতরে এবং বাইরে কর্সসূচি বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে। ডিসেম্বরের সমীক্ষা প্রতিবেদনটি টাঙ্গাইল সদর থানার ১৫টি গ্রামের ভিজিডি কার্ডধারী মহিলাদের নিয়ে ৬টি দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়।

এখানে উলেখ্য করা দরকার যে, এই সারাংশে বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। সমীক্ষা তিনটি ১৯৯৫ সালের জুন (প্রথম), অক্টোবর (দ্বিতীয়) এবং ডিসেম্বর মাসে (তৃতীয়) করা করা।

প্রথম সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল কতিপয় আর্থ–সামাজিক এবং পুষ্টিমানে আইজিভিজিডি'র প্রভাব নির্ধারণ। এ সমীক্ষাটি ৫৩৮টি পরিবারের মোট ৬৬৫ জন শিশুর উপর পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় কর্মসূচিভূক্ত ও কর্মসূচি বহির্ভূত পরিবারের মধ্যে পুষ্টিমানের একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল কর্মসূচি বাস্তাবায়নের প্রায় এক বৎসর পর প্রাক্-স্কুল শিশুদের পুষ্টিমানের উপর আইজিভিজিডি'র কোন প্রভাব রয়েছে কিনা তা যাচাই করা। সর্বশেষ অর্থাৎ তৃতীয় সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের পুষ্টিমানের উপর আইজিভিজিডি'র প্রভাব সম্পর্কে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের উপলব্ধি কি তা নির্ণয় করা। এছাড়া সদস্য মহিলারা নিজেদের উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধির ব্যাপারে কতখানি সচেতন সে ব্যাপারে জানাও এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

জুন' ৯৫ সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, কর্মসূচিভূক্ত পরিবার উন্নত প্রজাতির মুরগী পালন করে। এছাড়া গরু ছাগল পালন, সবজি চাষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আইজিভিজিডি পরিবারসমূহ উভয় নিরীক্ষা শ্রেণীর তুলনায় বেশি টাকা আয় করে। প্রায় ৯৮% আইজিভিজিডি পরিবার বিশুদ্ধ পানি পায়, কর্মসূচি বহির্ভূত অন্য দু'টি গ্রুপের বেলায় এ হার কিছুটা কম (৯৪% এবং ৮৯%)। শতকরা ১৫ ভাগ আইজিভিজিডি কর্মসূচিভূক্ত শিশু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ডিম খেতে পায়। কর্মসূচি বহির্ভূত শিশুদের মধ্যে এ হার মাত্র

৬ ভাগ। কৃশকায় শিশুদের সংখ্যা আইজিভিজিডি পরিবারে সবচেয়ে কম (৪.১%), অন্য দু'টি ক্ষেত্রে এ হার অনেক বেশি (৪.৮% এবং ৯.২%)।

দেখা যায় যে, আইজিভিজিডি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী পরিবার সমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং এর ফলে প্রাক্-স্কুল শিশুদের পুষ্টিমানের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

অক্টোবর' ৯৫ সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, খানা প্রধান হিসাবে মহিলাদের সংখ্যা কর্মসূচি বহির্ভূত খানার চেয়ে আইজিভিজিডি খানায় বেশি। এই কর্মসূচিভুক্ত খানাই অন্যান্যদের চেয়ে ভাল জাতের হাঁস-মুরগী বেশি পালন করছে। আইজিভিজিডি কর্মসূচিভুক্ত মহিলাদেরকেই বেশি ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্যভুক্ত হতে দেখা যায়। গরু, ছাগল, হাস-মুরগী, শাক-সবজি বিক্রি করে অন্যান্যদের চেয়ে কর্মসূচিভুক্ত খানার আয় অনেক বেশি হয়। আইজিভিজিডিভুক্ত প্রায় সকল খানাতেই বিশুদ্ধ পানি পান করা হয় (৯৯%)। অন্যান্যদের চেয়ে এই কর্মসূচিভুক্ত খানা বেশি স্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করে। শতকরা ৪০ জন মা পায়খানা থেকে এসে সাবান ব্যবহার করে যা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ১৫ ও ২৮%।

সমীক্ষার ফলাফল থেকে প্রতিভাত হয় যে, আইজিভিজিডি কর্মসূচি গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি প্রাক-স্কুল শিশুসহ দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর পুষ্টিমান বাড়াতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে।

সমীক্ষার ফলাফলে জানা যায় যে, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলারা মুরগী পালনে খুব আগ্রহী, কারণ তাদের স্বাভাবিক গৃহস্থালি কর্মের সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিচিত। মুরগীর চিকিৎসা ও মৃত্যুরোধে মুরগীর চিকিৎসকদের দায়িত্ব অনেক, এবং গ্রামবাসীরা তাদেরকে খুব সম্মানের চোখে দেখে। অধিকাংশ মহিলা অর্থনৈতিকভাবে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর নির্ভরশীল নয়। দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তারা নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম। বেশির ভাগ আইজিভিজিডি মহিলা দ্বিমাসিক ইস্যুভিত্তিক মিটিংগুলিতে অংশ নিয়ে ডায়রিয়া, সর্দি, রাতকানা রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি সাধারণ রোগসমূহ সম্পর্কে জানতে পেরেছে। সমীক্ষায় এটাও দেখা গেছে

যে, অংশগ্রহণকারী মহিলারা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাদি সম্পর্কে অধিকতর সচেতন। এই কর্মসূচি মহিলাদের জীবনে গতিশীলতা বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন, তারা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং উন্নয়ন কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছে, সামাজিক বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে। সবচেয়ে বড় কথা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে।

তাই বলা যায় যে, আইজিভিজিডি কর্মসূচি অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে সফলভাবে পৌঁছেছে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পুষ্টিমানের উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়েছে।

পরিবারের আকার নির্ধারণে মতলব এলাকায় দম্পতিদের পছন্দ*

শাহরিয়ার রেজা খান, এ এম আর চৌধুরী এবং আব্বাস ভূইয়া

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত জন্মশীলতা ও পরিবারের আকার সংক্রান্ত যত সমীক্ষা চালানো হয়েছে তা ছিল শুধুমাত্র মহিলাদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক। শিশু জন্মদান কিংবা পরিবারের আকার নির্ধারণে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই ভূমিকা থাকে। তবে গ্রামীণ এলাকায় পরিবারের আকার নির্ধারণে পুরুষদের ভূমিকা বেশি, তাই এ সমীক্ষায় মহিলা ও পুরুষ উভয়কেই সম্পৃক্ত করা হয়।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর, বি) চাঁদপুর জেলার মতলবে একটি ডায়রিয়া চিকিৎসা কেন্দ্র ও এলাকার অন্যত্র স্থানীয়ভাবে পরিচালিত তিনটি উপকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে ডায়রিয়ার চিকিৎসা প্রদান করছে। এ ছাড়া মা এবং শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবাও দেয়া হয়। গবেষণার সুবিধার্থে তারা গড়ে তুলেছে বিশাল এক ডাটা ব্যাংক যা Demographic Surveillance System বা DSS নামে পরিচিত। এ তথ্য ভান্ডারে আছে নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের সম্পূর্ণ তথ্য যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এলাকা ত্যাগ বা নতুন আগমণ ইত্যাদি। এ বিশাল উপাত্ত বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

ব্র্যাক ১৯৯২ সালে মতলবে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি বা আরডিপি'র একটি শাখা খোলে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়। ফলে এ এলাকায় গবেষণার নতুন এক দিগন্ত উম্মোচিত হয়। এ সুযোগটি ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর, বি একত্রে কাজে লাগানোর জন্য একটি যৌথ গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়। সমীক্ষাটিতে পরিবারের আকার নির্ধারণে স্বামী ও স্ত্রীর পছন্দে মিল ও অমিল দেখা হয়েছে। সমীক্ষা পরিচালনার পূর্বে ধারণা করা হয়েছিল যে, পরিবারের আকার নির্ধারণে মতলব এলাকার পুরুষ ও মহিলাদের পছন্দে কোন পার্থক্য নেই এবং আর্থ–সামাজিক পরিস্থিতি এ বিষয়ে কোন প্রভাব ফেলে না।

---

* Summary of the RED research report entitled "Family size preference in Matlab couples" by Shahriar Reza Khan. et al. 1995 December. 13p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

সমীক্ষায় দেখা গেছে, ব্র্যাক সদস্য হওয়ার যোগ্য এমন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবারের আকার নির্ধারণে পুরুষ ও মহিলাদের মনোভাব প্রায় সমান। তবে পুরুষদের চেয়ে মহিলারাই বেশি সংখ্যক সন্তান কামনা করে। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সন্তানের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তাদের অনেকেরই ৫ জনেরও বেশি সন্তান রয়েছে অথচ মাত্র দু'জন সন্তানই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। আবার যে সকল পুরুষ কখনো স্কুলে যায়নি তারা তিন জনেরও বেশি সন্তান কামনা করেন কিন্তু মহিলাদের বেলায় তা ৪ জন। যারা ১-৫ বছর পর্যন্ত স্কুলে গিয়েছে এমন পুরুষদের সন্তানের চাহিদা যারা কোন দিন স্কুলে যায়নি তাদের চেয়ে কিছু কম এবং মহিলাদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এভাবে দেখা যায়, পুরুষ কিংবা মহিলাদের পড়াশোনা যত বেশি তাদের অধিক সন্তানের চাহিদা তত কম এবং পরিবারে তাদের সন্তান সংখ্যাও অনেক কম।

চাকুরিজীবি পুরুষ ও মহিলাদের সন্তানের চাহিদা প্রায় সমান তবে এ ক্ষেত্রে মহিলাদের চাহিদা একটু বেশি। চাকুরিজীবি নয় এমন পুরুষদের সন্তানের চাহিদা চাকুরিজীবি মহিলাদের চেয়ে অনেক বেশি। এক্ষেত্রে পুরুষদের কাছ থেকে জানা যায়, পরিবারে তাদের ৪ জনেরও বেশি সন্তান রয়েছে এবং মহিলাদের কাছ থেকে জানা যায় পরিবারে তাদের ৩ জনের বেশি সন্তান রয়েছে। বহু বিবাহিত পুরুষদের চেয়ে বহু বিবাহিত মহিলাদের সন্তানের চাহিদা অনেক কম। (পুরুষ ৪.২৯ এবং মহিলা ৩.৬৩)। জন্ম নিরোধক ব্যবহার করে এমন পুরুষদের ৪ জন সন্তান এবং যারা ব্যবহার করেনা এমন পুরুষদের সন্তানের প্রত্যাশা তুলনামূলকভাবে কিছু কম। মহিলাদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

বাড়ির বাইরে গিয়ে মহিলাদের কাজ করাকে যারা ভাল চোখে দেখে এমন পুরুষ এবং মহিলাদের সন্তানের প্রত্যাশা প্রায় সমান এবং এসকল পরিবারের প্রায় সমান সংখ্যক সন্তানই রয়েছে (৩.৪৩ ও ৩.৪১)। বাড়ির বাইরে গিয়ে মহিলাদের কাজ করাকে যারা ভাল চোখে দেখে না এমন পুরুষ এবং মহিলাদের সন্তানের প্রত্যাশা অনেক বেশি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে তা আরো বেশি (৪.০৮ ও ৪.২৬)। আবার যারা ব্র্যাক কর্মসূচিতে গ্রহণযোগ্য নয় এমন পুরুষ ও মহিলাদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বেশি সন্তানের প্রত্যাশাও বৃদ্ধি পায়। তবে এ ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সন্তানের প্রত্যাশা অনেক বেশি (পুরুষ ৪.২১ এবং মহিলা ৫.৯৪)। পরিবারের আকার নির্ধারণে শিক্ষার প্রভাব রয়েছে। যে সকল পুরুষ

কখনো স্কুলে যায়নি, পরিবারে তাদের যে সন্তান রয়েছে তাদের প্রত্যাশা তার চেয়ে বেশি। মহিলাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। দেখা গেছে, মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই পড়ালেখা যত বেশি তারা ততই কম সন্তানের প্রত্যাশী এবং সন্তান রয়েছেও কম। আবার যারা কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত আছে এমন পুরুষদের সন্তানের প্রত্যাশা মহিলাদের চেয়ে অনেক বেশি।

বাংলাদেশের পুরুষ শাসিত সমাজে পরিবারের আকার কিরূপ হবে তার সিদ্ধান্ত দেন সাধারণতঃ পুরুষরাই। কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে স্ত্রীরা পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। সমাজে দেখা যায়, বহু বিবাহিত মহিলারা গর্ভনিরোধে আগ্রহী, তবে বহু বিবাহিত পুরুষরা অধিক সন্তানের প্রত্যাশী। পুরুষ কিংবা মহিলাদের শিক্ষা দীক্ষা পরিবারের আকার সীমিত রাখতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে লক্ষ্য করা গেছে যে, জনগণ পরিবারের আকার সম্পর্কে বেশ সচেতন এবং পুরুষ মহিলা উভয়েই মতামত ব্যক্ত করেছে যে, একটি আদর্শ খানার দু'টি সন্তানই যথেষ্ট। কিন্তু বাস্তবে তারা অধিক সন্তানের প্রত্যাশী। দু'টি সন্তান যথেষ্ট জেনেও কেন তারা অধিক সন্তানের প্রত্যাশী তা বের করা একটি দূরহ কাজ।

জন্মশীলতা পরিবর্তনে গ্রামীণ এলাকায় ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব*

আবদুলাহেল হাদী, রুহুল আমিন ও এ এম আর চৌধুরী

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ তেমন উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক কোন উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় না। এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৮০ সাল থেকে এ দেশের জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এর ফলে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতিও হয়েছে। জন্মশীলতার উপর পূর্বে বিভিন্ন সময়ে সমীক্ষা হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে আর্থ–সামাজিক অবস্থাকে জন্মশীলতা পরিবর্তনের তেমন কোন কারণ হিসেবে ধরা হয় না। বরং মানুষের বহুমূখী আয়, বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলো জন্মশীলতায় বেশি প্রভাব ফেলে। আবার এও বলা হয় যে, এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার হস্তক্ষেপ বেশি প্রভাবিত করে। জনগণের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জন্মশীলতার পরিবর্তনে উন্নয়ন সংস্থাগুলির কোন প্রভাব আছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য এ সমীক্ষাটি হাতে নেয়া হয়েছে।

‘ওয়াচ’ নামক ব্র্যাকের এক নিবন্ধন পদ্ধতির মাধ্যমে এ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ পদ্ধতি প্রথমত: মানিকগঞ্জ জেলার তিনটি ইউনিয়নে ১৯৮৬ সালে শুরু হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা (১৯৮৭ সালে) জয়পুরহাট জেলায় তিনটি ইউনিয়নে সম্প্রসারিত করা হয়।

১৯৮৯ এর মাঝামাঝি এবং ১৯৯০ এর গোড়ার দিকে ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত ও কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সমীক্ষার জন্য বাংলাদেশের অনুন্নত এলাকা থেকেই পরীক্ষমূলক ও তুলনামূলক এলাকা নেয়া হয়েছে। দেখা গেছে, জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আশির মাঝামাঝি ও নব্বইয়ের গোড়ার দিক থেকে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশির মাঝমাঝি পর্যন্ত ব্র্যাক কর্মসূচিভূক্ত এলাকায় মেয়েদের মাত্র শতকরা ১২ জন এবং কর্মসূচি বহির্ভূতদের শতকরা ২১ জন স্কুলে পড়াশুনা করেছে। কিন্তু নব্বই এর গোড়ার দিকে

---

* Summary of the RED research report entitled “Impact of BRAC’s development programme on fertility change in rural Bangladesh” by Abdullahel Hadi, et al. 1995. 9p. (Summarized in Bangla by Noorjahan Akter Shetoo)

ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় এ হার দাড়ায় শতকরা ৩০ এবং কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় এ হার দাড়ায় শতকরা ৩৮ এ। কর্মসূচিভুক্ত এলাকা ও কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার শিক্ষার এ বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় এখন আরো বেশি। স্কুলে পড়াশুনার গড় বছরও ব্র্যাক কর্মসূচিভূক্ত এলাকার চেয়ে কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় কম।

আশির মাঝামাঝিতে যদিও উন্নয়ন কর্মসূচিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ব্র্যাক কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার চেয়ে কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু নব্বই এর গোড়ার দিকে দেখা গেছে, ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত এলাকা এবং কর্মসূচি বহির্ভূত এ দুই এলাকাতেই উন্নয়ন কর্মসূচিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। এর কারণ হল, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সাথে সরকারও বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

উত্তরাধিকার প্রথা চালু থাকার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির মালিকানা, জমির অংশ ও অনাবাদি জমির পরিমাণ ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত এলাকা ও কর্মসূচি বহির্ভূত উভয় এলাকাতেই কমেছে।

আশির মাঝামাঝি ও নব্বই এর গোড়ার দিকে ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত এলাকার চেয়ে কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় জন্মশীলতার হার অনেক বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এ হার হ্রাস পেতে থাকে। কর্মসূচিভুক্ত এলাকাতেই এ হ্রাসের হার বেশি। বয়সের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যাদের বয়স ২৪ এর উর্ধ্বে তাদের জন্যই এ হার হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া আর্থ–সামাজিক অবস্থা ও সকল পর্যায়ের শিক্ষিত জনগণের মনোভাব ও স্বামীর পেশা জন্মশীলতার হ্রাসে প্রভাব ফেলে। দেখা গেছে, ১৯৮৭ এর তুলনায় ১৯৯৩-এ জন্মশীলতার হার ৮৭%-এ হ্রাস পেয়েছে। এটা অবশ্য ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত এলাকায়। দেখা যায়, জন্মশীলতার সাথে মহিলাদের বয়স ওতোপ্রতভাবে জড়িত।

ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় শিক্ষা ও উন্নয়ন সংস্থার হস্তক্ষেপের জন্য জন্মশীলতার হার কমেছে। কর্মসূচি এলাকায় মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই জন্মশীলতা হ্রাসে বেশি ভূমিকা রাখে। ব্র্যাক কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় ধর্মীয় বিশ্বাস তেমন একটি প্রভাব ফেলেনি। ব্র্যাক এলাকায় খানার জমির পরিমাণও জন্মশীলতার সাথে জড়িত কিন্তু কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় নয়।

অবশেষে, আশির মাঝামাঝি ও নব্বই এর গোড়ার দিকে কর্মসূচি এলাকায় জন্মশীলতার হার হ্রাস পেয়েছে। এ হ্রাস ঘটেছে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী কিংবা ব্র্যাক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে কিংবা করেনি সকলেরই। যখন ব্র্যাকের কোন কর্মসূচি কোন গ্রামে শুরু হয় তখন এর সুফল শুধু সরাসরি সুবিধাভোগীরাই পায়না বরং এলাকাবাসী সকলেই এ কর্মসূচির সুফলের ছোয়া পায়। সকল উন্নয়ন সংস্থা জনগণকে একটি বিষয় দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিতে পারে যে, পরিবার ছোট রাখতে হবে। জন্মশীলতা হ্রাসে মহিলাদের শিক্ষা বিরাট ভূমিকা পালন করে সুতরাং এক্ষেত্রে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষারও অবদান রয়েছে। গ্রামীণ ঋণ প্রকল্প ও আয় উৎপাদনমূলক কর্মকান্ড চাকুরীর সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং জন্মশীলতা হ্রাসে ভূমিকা রাখে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিশু পরিচর্যা কর্মসূচি ব্র্যাক কর্মসূচি এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখে যা মূলত: ছোট পরিবার গড়তে কিংবা জন্মশীলতা হ্রাসেই ভূমিকা রাখে। দেখা গেছে, ব্র্যাক কর্মসূচি এলাকায় কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকার চেয়ে বেশি মহিলারা বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত।

ব্র্যাক কর্মসূচি এলাকায় ও কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় জন্মশীলতা হ্রাসে প্রথমত: উন্নয়ন সংস্থাগুলোর বিবিধ কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য যদিও জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও বিশেষ ভূমিকা রাখে। দরিদ্র আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতেও পরিবার ছোট রাখা ও জন্মশীলতা হ্রাস সম্ভব যদি লক্ষ্যগোষ্ঠী নির্ধারণ করে উন্নয়মূলক কর্মসূচি হাতে নেয়া যায়।

কর্মসূচিভূক্ত এলাকায় গর্ভনিরোধক ব্যবহারে পরিবর্তন*

আবদুলাহেল হাদী

বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা তৃনমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যহতভাবে চালিয়ে যাচেছ। উন্নয়ন সংস্থাগুলো দরিদ্রদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য চালিয়ে যাচ্ছে নিরলস প্রচেষ্টা। দরিদ্র মহিলাদের ঋণ প্রদান করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত করে তাদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্যও হাতে নিচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচি। ব্র্যাকের এ গবেষণাটি মানিকগঞ্জে ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত এলাকার মহিলাদের মধ্যে গর্ভনিরোধক ব্যবহারে কী পরিবর্তন এসেছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যই করা হয়। ১৯৮৬ সালে মানিকগঞ্জের ৮৭টি গ্রামের ১১,০১১ জন মহিলা বিভিন্ন সংস্থার সাথে জড়িত ছিল। ১৯৯৪ সালে অর্থাৎ আট বছর পরে ১১-৪৯ বছর বয়স্ক ৫,৪০৯ জন বিবাহিতা মহিলাকে বেছে নেয়া হয় এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য।

এ গবেষণা থেকে দেখা যায়, ১৯৮৬ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ মহিলা গর্ভনিরোধক ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে খাবার বড়ি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে সবচেয়ে বেশি (৫.৬ থেকে ২২.০৯)। দেখা গেছে, ৩০-৩৯ বছর বয়স্ক মহিলাদের মধ্যেই গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার অত্যন্ত বেশি। এর কারণ হতে পারে যে, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী ব্যবহারের জন্য এই মধ্যবয়সী মহিলাদেরকেই বেশি উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং সাধারণতঃ যাদের দু'টি সন্তান রয়েছে। যেহেতু এ বয়সেই আরো অধিক সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা বেশি থাকে।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, যে সব খানার কম জমি রয়েছে তাদেরকে সাধারণত: বাইরে কোথাও কাজের জন্য যেতে হয় যা গর্ভবতী অবস্থায় সম্ভব নয়। এ বিষয়টি হয়তো কম জমির খানার মহিলাদের গর্ভরোধক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৯৯৪ সালের সমীক্ষায় দেখা যায়, অশিক্ষিত ও দরিদ্র খানার

* Summary of the RED research report entitled "Change in contraceptive use in BRAC village in Bangladesh" by Abdullahel Hadi. 1995. 7p. (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

সদস্যদের মধ্যে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার অনেক বেশি। গর্ভনিরোধক ব্যবহারের ক্ষেত্রে খানায় কিছুটা হলেও স্বামীদের পেশার প্রভাব রয়েছে। যেমন দেখা গেছে, যে সকল মহিলাদের স্বামীরা দিন মজুর কিংবা কোন কৃষিকাজে জড়িত তাদের মধ্যে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার একটু বেশি। তবে ১৯৮৬ সালের তুলনায় এ হার ১৯৯৪ সালে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

যে সকল মহিলা কোন না কোন উন্নয়ন সংস্থার সাথে জড়িত তাদের মধ্যে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশি। স্বামীদের পেশার ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যে সকল স্বামীদের পেশা ছিল ব্যবসা তাদের স্ত্রীদের গভনিরোধক ব্যবহারের হার বেড়েছে দ্বিগুণ। ১৯৯৪ সালের সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা কোন উন্নয়ন সংস্থার সদস্য কিংবা শুধুমাত্র ঋণ নিয়েছে তাদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার প্রায় সমান।

এ গবেষণায় আরো দেখা গেছে, শতকরা ১২.৬ জন যারা কোন রকম গর্ভনিরোধক ব্যবহার করতো না তারা ১৯৮৬-১৯৯৪ এর মধ্যে বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণের বিষয়টিও গর্ভনিরোধক ব্যবহারে প্রভাব ফেলে।

--